ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ২২ সংখ্যা ।। ১ ফাল্গুন, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ।। Website : www.eswastika.com

জনগণনা - ২০১১

অনুপ্রবেশকারীরাও কি নাগরিকত্ব পেতে চলেছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগামী ৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি গোটা দেশজুড়ে হতে চলা জনগণনা ২০১১-র সংযোজিত হবে বেশ কিছু নতুন বিষয় যা অভিনব তো বটেই, সেইসঙ্গে এদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য তা সংঘটিত হবে। আর এই সমস্ত অভিনব ব্যাপারের মাঝেই জনগণনা কমিশনার সি চন্দ্রমৌলী গত ২ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের জনসংখ্যা গণনার ম্যাসকটের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানের মাঝে মেনে নেন, ''এদেশে অবস্থিত প্রত্যেককেই জনগণনার আওতায় আনা হবে। এমনকী তিনি যদি অবৈধভাবে এদেশে (ভারতে) প্রবেশ করে থাকেন তাকেও।''

চন্দ্রমৌলী জানান, এবারের জনগণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতে থাকা প্রত্যেকের সংখ্যা গণনা করা, তাঁরা কোন দেশের প্রকৃত অধিবাসী তা না দেখেই। জনগণনা কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই প্রবল সমালোচিত হচ্ছে দেশজুড়ে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতে বাস করা জনসংখ্যা আর ভারতের নাগরিক— এই দুটো বিষয় এক করে ফেলা হচ্ছে। বিশেষ করে, অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে বসবাস করা এখন আর কোনও গোপনীয় ব্যাপার নয়।

কিন্তু জনগণনা করতে গিয়ে এদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের একাসনে বসিয়ে দিলে আদতে ভবিষ্যতে অনুপ্রবেশকারীদের এদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের পথই প্রশস্ত হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

এই প্রথমবার জনগণনায় লিঙ্গ পরিবর্তনকারী (ট্রান্স-জেন্ডার)-দের জন্য থাকছে আলাদা তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা। বিবাহ-বিচ্ছিন্ন এবং ডিভোর্সী মহিলাদেরও পৃথকভাবে গণনার আওতায় আনা হবে। এতদিন পর্যন্ত বারবণিতারা 'ভিখারী' হিসেবেই বিবেচিত হতেন জনগণনার তালিকায়। এবার থেকে তাঁরাও 'অন্যান্য' হিসেবে অভিহিত হবেন। সদ্য আসন্ন ২০১১ জনগণনায় অভিনব তথ্যের কমতি নেই। লিঙ্গ-পরিবর্তনকারীরা কতটা সাক্ষর সেই তথ্যও উল্লিখিত থাকবে জনগণনার খতিয়ানে।

সেনসাস কমিশনার সি চন্দ্রমৌলী

সামগ্রিকভাবে দেখা হবে স্কুলে হাজিরার পরিসংখ্যানও। 'নন-ইকোনমিক' কার্যকলাপ এবং অনির্দিষ্ট আয়ের উৎসসম্পন্ন মানুষদের জন্যও থাকবে পৃথক পরিসংখ্যান। 'মাইগ্রেশন' বিষয়টিও সংযোজিত হবে জনগণনায়।

সেনসাস কমিশনার সি চন্দ্রমৌলী একইসঙ্গে জানিয়েছেন, এই অভিনব বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্যবারের জনগণনার মতোই বিদেশী দূতাবাস এবং কনস্যুলেটগুলো বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিটি গৃহ, ধর্মীয় ও জনসাধারণের জায়গা এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের লিঙ্গ, ধর্ম, জীবিকা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় তথ্য থাকবে। সরকারী সূত্রে জানানো হয়েছে, আসন্ন জনগণনা ২০১১-ই হতে চলেছে এখনও পর্যন্ত বৃহত্তম জনসংখ্যা গণনা, যেখানে রাজ্য এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল মিলিয়ে ৩৫টি প্রদেশের প্রায় ১২০ কোটি মানুষের তথ্য থাকবে। 'জাত-পাত' (কাস্ট) সংক্রান্ত তথ্যও পৃথকভাবে সমীক্ষা করা হবে এ বছরেরই জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। এছাড়াও ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এন পি আর) রচনা করার জন্যও জনগণনা ২০১১-র কর্মীরা কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন বলে জানানো হয়েছে।

সব মিলিয়ে ৬৪০টি জেলার ৬ লক্ষাধিক গ্রাম এবং ৭৭৪২টি শহরের এই জনগণনায় খরচ পড়বে ২,২০০ কোটি টাকা। নাগরিক মাথা পিছু ১৮.৩৩ টাকা। খরচ পড়বে বলে জানা গিয়েছে। যাযাবর জনসংখ্যা (মাইগ্র্যান্ট পপুলেশন)-র গণনা হবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে এয়ারপোর্ট, রেল স্টেশন, বন্দর এবং বাস-টার্মিনাল চত্বরগুলিতে।

একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাচ্ছে, ভারতবাসীর পকেটের এত টাকা খরচ করে জনগণনার যে মহাযজ্ঞ হবে তাতে অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে বসবাসের আইনী স্বীকৃতির বন্দোবস্ত করার আগে জনগণনার নীতি-পরিবর্তন করাটাই কি বাঞ্ছনীয় ছিল না?

বাংলাদেশ সীমান্তেই মালদার জনসংখ্যার অর্ধেকের বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের সমীক্ষায় মালদা জেলার চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪১৭ জন; এদের মধ্যে প্রায় ২১ লক্ষ লোকই বাংলাদেশ ও বিহার লাগোয়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মাত্র সাতটি ব্লকের বাসিন্দা। জেলায় মোট ব্লকের সংখ্যা ১৫ টি। মূলত, বাংলাদেশী মুসলিম

সচিত্র পরিচয়পত্র হাতে জনৈকা অনুপ্রবেশকারিণী।

অনুপ্রবেশের কারণেই জনসংখ্যার ভারসাম্যের এই ব্যাপক বৈষম্য ও পরিবর্তন। আশির দশকেই বাংলাদেশে বসবাসরত 'বিহারী মুসলমানরা' (উর্দুভাষী) ভারতের ভিতর দিয়েই 'লং মার্চ' করে পাকিস্তানে যাওয়ার ঘোষণা করেছিল। তাছাড়া ওই সময়ে বামরাজত্বে খোদ কলকাতায় মোহাজির মুসলমানরা সভা করে ভারতের নাগরিকত্ব দাবী করে মিছিল করেছিল। একথা অনেকেরই স্মরণে থাকার কথা। ভোট-ব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে ওইসব বাংলাদেশীরা পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ লাগোয়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলোতে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত। যদিও জেলাশাসক প্রমলকুমার সামন্ত বলেছেন, প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

কেন্দ্র সরকারের নির্দেশে ২০১০ সালে জেলা জুড়ে পারিবারিক সমীক্ষা করে জেলা প্রশাসন। ওই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, জেলার ১৫টি ব্লকে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৩৯টি পরিবার বসবাস করে। যাদের মোট জনসংখ্যা হলো—৩৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪১৭ জন। এর মধ্যে সীমান্ত লাগোয়া সাতটি ব্লকের জনসংখ্যাই ২০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৫ জন। এই ব্লকগুলির মধ্যে আবার বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ইংলিশবাজার ব্লকের জনসংখ্যা সর্বাধিক। শহর ও গ্রাম মিলিয়ে ইংলিশবাজারের লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০৮ জন। বাংলাদেশ লাগোয়া অন্য ব্লক— পুরাতন মালদার জনসংখ্যা ২ লক্ষ ৬ হাজার ২৬৫ জন, কালিয়াচক ৩নং ব্লকের ৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৩২৭ জন। হবিবপুরের ২ লক্ষ ১২ হাজার ৭২৯ এবং বিহার লাগোয়া হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের জনসংখ্যা ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫০০ জন।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে ব্যাপক অনুপ্রবেশ এবং রাজনৈতিক মদতেই জনসংখ্যার ব্যাপক রদবদল ঘটেছে যা ভবিষ্যতের জন্য ইঙ্গিতবহ।

জম্মু-কাশ্মীরে শ্মশানের শান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি যে পরোক্ষে আন্তরিক সমর্থন রয়েছে তা আরিফা ও আখতারা নামে দুটি মেয়ের হত্যার ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে গেল। গত ৩১ জানুয়ারি উত্তর কাশ্মীরের সোপর শহরের 'মুসলিম পীর' এলাকায় তাদের বসতবাড়ি থেকে সন্দিগ্ধ 'লস্কর এ তৈবা' জঙ্গিরা বাড়ির লোকেদের সামনেই বন্দুকের মুখে তুলে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলির শব্দ। তাদেরকে হত্যা করা হয়। আরিফার বয়স কুড়ি আর আখতারার বয়স মাত্র সতেরো বছর। পরদিন তাদের মৃতদেহের সঙ্গে প্রায় হাজার লোকের নিস্তব্ধ নির্বাক শবযাত্রা বের হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাসহ বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ৎ কনফারেন্সের দু'তরফের নেতারাই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেই দায় সেরেছেন। অথচ এরাই সেনাবাহিনীর গুলিতে বিক্ষোভরত কেউ মারা গেলে উপত্যকায় লাগাতার অস্থিরতা তৈরি করেন। নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের তাক করে পাথর ছোঁড়েন। দিল্লীতে দরবার করে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহার করার দাবী জানান। এই ঘটনায় ওমরের দ্বিচারিতার তীব্র নগ্ন রূপ আরও একবার প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সম্ভবত লস্কর জঙ্গিদের হাতে নিহত আরিফা ও আখতারার মৃতদেহের পাশে শোকস্তব্ধ পরিবার।

মেয়ে দুটির বাবা গুলাম নবী দার একজন সাধারণ শ্রমিকমাত্র। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন— 'সন্ধ্যার নমাজের পর বাড়িতে বসেছিলাম। ওরা কয়েকজন (সশস্ত্র উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদীরা) এল। একজন আমার সামনে দাঁড়াল। অপর একজন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মেয়েদের ধরে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই গুলির শব্দ। তখনই বুঝলাম আমার মেয়েদেরকে হত্যা করা হয়েছে।' সাধারণ মানুষ এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করলেও কোনও সোচ্চার প্রতিবাদ জানায়নি।

রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দু'লক্ষ টাকা নিহতদের পরিবারকে দিয়ে কর্তব্য সেরেছেন। তবে সরকার বুঝে উঠতে পারছে না কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার আলতাফ খান বলেছেন, 'লস্কর এ তৈবা'-জঙ্গিরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তাদের দু'জন স্থানীয়। তাদেরকে তারা চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

হতভাগ্য মেয়ে দুটির কাকা মীরাজুদ্দিন

(এরপর ৪ পাতায়)

দেশব্যাপী সঙ্ঘের সম্পর্ক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একতরফা অপপ্রচারের জবাব দিতে এবার সরাসরি জনতার দরবারে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সারা ভারতজুড়ে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস প্রচার পুস্তিকা নিয়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিষয়টা তুলে ধরবেন। সঙ্ঘের বক্তব্য হলো, এই অপপ্রচার মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ষড়যন্ত্রমাত্র। এর কোনও বাস্তব ভিত্তিই নেই।

বিগত একবছর যাবৎ এরকম অপপ্রয়াস জোরদার করা হয়েছে। একারণেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক বন্ধ ঘরে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেওয়া জবানবন্দী 'তহেলকা'-র মতো মিডিয়ার কাছে ফাঁস হয়ে যায়। 'সীম'-কার্ডের জন্য আবেদনের ফর্ম থেকে সই জাল করে বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি প্রচার করানো হচ্ছে। এই অভিযোগ তথাকথিত অভিযুক্তদের বাড়ির লোকের। সংবাদমাধ্যম সন্ন্যাসীর বাড়ি খুঁজে বের করে বাড়ি লোকের সাক্ষাৎকার নিতে দৌড়োয়।

এবার এসব কথা পুস্তিকা ও ব্যক্তিগত কথাবার্তার মাধ্যমে স্বয়ংসেবকরা সর্বসাধারণ জনতার কাছে তুলে ধরবেন বলে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাধিক গ্রাম, শহর ও পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি স্বয়ংসেবকরা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছাবেন। সঙ্গে থাকছে দুটি ছোট পুস্তিকা। একটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, অন্যটি পাঁচ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা হবে। একটি পুস্তিকার শীর্ষক

'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কবলে ভারতীয় সংস্কৃতি' অন্যটির নাম 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ— একটি রাজনৈতিক অপপ্রচার।'

অধুনা যে সব বিষয় একতরফাভাবে একশ্রেণীর মিডিয়ার দৌলতে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এই দুটি পুস্তিকাতে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি

(এরপর ৪ পাতায়)

ক্রমশ ডুবছে সি পি এমের ফুটো নৌকো

নিশাকর সোম

সিপিএম-এর অন্দরমহলের কিছু খবর জানাই। সম্প্রতি আগরতলায় ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত নৃপেন চক্রবর্তীর জন্মশতবার্ষিকী সভায় সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''জীবনের শেষদিকে নৃপেনদা কিছু ভুল করলেও তাঁর অবদান ভোলা যায় না এবং সেই বিরাট অবদান ত্রিপুরায় পার্টিকে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জ্যোতি বসুর সমালোচনা করায় জ্যোতি বসু-হরকিষেণ সিং সুরজিতের গোষ্ঠী নৃপেন চক্রবর্তীকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তখন এই সিদ্ধান্ত ত্রিপুরা-রাজ্য-কমিটি মেনে নিতে পারেনি। মুখবন্ধ করে ছিল মাত্র। কিন্তু তারা নৃপেনবাবুকে পার্টি কমিউন থেকে উচ্ছেদ করেনি। প্রকাশ কারাত আগাগোড়াই জ্যোতি বসু বিরোধী ছিলেন। জানা দরকার ত্রিপুরা রাজ্য-সিপিএম তথা মানিক সরকার নৃপেন চক্রবর্তীকে কখনও অসম্মান করেননি এবং পার্টি কমিউনে থাকার ব্যবস্থাও বাতিল করেননি। যদিও নৃপেন চক্রবর্তীর মৃত্যুর আগে তাঁর সভ্যপদ 'ফেরত' দেওয়া হয়েছিল। কমিউনিস্টরা কিরকম নিষ্ঠুর হতে পারে এই ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া যায়। যে নৃপেনবাবু একদিন অবিভক্ত পার্টিতে জ্যোতি বসু-সের নেতা ছিলেন, তাঁকেই হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল।

রাজ্য সিপিএমের অভ্যন্তরের ঘটনা হলো—দীপক সরকার-সুশান্ত ঘোষের মাথা তুলে দাঁড়ানো বন্ধ হয়েছে। একই সঙ্গে বিমান বসু-বুদ্ধদেবকে 'সাইড' করে গৌতম দেবের উত্থান হয়েছে। গৌতম দেব পার্টির নিচের তলার কর্মীদের কাছে বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নেতা। কলকাতা জেলা পার্টির পক্ষ থেকে অলোক মজুমদার-কে পার্টিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে— বুদ্ধবাবুর বক্তব্য বাতিল হয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্দরমহলে ব্যাপক দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। খবরে প্রকাশ, কলকাতার প্রায় শতাধিক কর্মী তৃণমূলে চলে গেছেন। এটাই স্বাভাবিক, কেননা একদা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ মমতাকে 'আমাদের নেত্রী' বলেছিলেন। তিনি সিপিএম ক্যাডারদের 'লুম্পেন' বলেছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনের পর বামফ্রন্টের বিভিন্ন দল 'কঙ্কাল' অবস্থায় পরিণত হবে। বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টি (আর এস পি)-এর বড় নেতা তথা মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী একাধিকবার বলেছেন, ''মমতা সঠিক পথে চলছেন।'' এবার এই 'সঠিক পথেই' আর এস পি কর্মীরা যেতে আরম্ভ করবেন!

সিপিএমের রাজ্যনেতাদের বুদ্ধবাবু-বিমান বসু-কে সরলা মাহেশ্বরীর ঘটনা বিপদে ফেলেছে। পার্টির মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, রাজারহাটে সরলা মাহেশ্বরীকে জমি পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রেজ্জাক মোল্লা, গৌতম দেব, বুদ্ধদেববাবু, বিমান বসু, রবীন মণ্ডল এবং তাপস চ্যাটার্জির ভূমিকা কি ছিল? সরলা মাহেশ্বরীর কীর্তি ফাঁস হবার পর মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার বক্তব্য হলো— ''পার্টির শুদ্ধিকরণ হচ্ছে না, বৃদ্ধিকরণ হচ্ছে।'' বুদ্ধদেববাবু পার্টিকর্মীদের জেনারেল এক সভায় বলেছিলেন— ''আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির মালিকদের পার্টি থেকে বের করে দেওয়া উচিত।'' বিমান বসু বলেছেন, ''তদন্তের খবর জানার পর ব্যবস্থার প্রশ্ন ওঠে।'' সরলা মাহেশ্বরী সম্পর্কে বহু অভিযোগ অনেক আগেই পার্টির রাজ্য নেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছিল। কিন্তু রাজ্য-নেতৃত্ব এ-ব্যাপারে কিছুই করেননি। কারণ কি? বুদ্ধবাবু এনিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেননি কেন? বিমানবাবু কেন অভিযোগ পেয়ে নিশ্চুপ ছিলেন। আসলে সিপিএমের নেতৃত্বের তথা কিছু পার্টি-সদস্যের মধ্যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে— কে কাকে ধরবে? পচনের দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে। নির্বাচকমণ্ডলীকে এসব বিচার করতে হবে না?

তৃণমূল আশ্রয় শিবির থেকে দু'জন 'মাওবাদী' কর্মীকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে পুলিশি হাঙ্গামায় সাংবাদিকদের আক্রান্ত হতে হয়েছে। এটা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে বুদ্ধবাবুর আমলে এটা নতুন নয়, এর শুরু হয়েছিল মহাকরণে প্রেস কর্ণার তুলে দেওয়া থেকে। মহিলা সাংবাদিকরা মহাকরণের সিপিএম ক্যাডারদের হাতে লাঞ্ছিত হন। এই ধৃত দুই যুবকের 'মাওবাদীদের সঙ্গে সংযোগের' কথা বলা হচ্ছে। এ ঘটনা নিয়ে রাজ্যপাল পুলিশকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং তিনি নাকি পুলিশকর্তাদের তিরস্কার করেছেন। এদের সম্বন্ধে বিমান বসুর বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন মন্ত্রী ও নেতা সুশান্ত ঘোষ। রাজ্য-সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য দীপক সরকার এ-ব্যাপারে নীরব আছেন। ইতিপূর্বে সিপিএমের আশ্রয়শিবির থেকেই 'হার্মাদ'বাহিনী গুলি চালিয়ে নেতাই-এর ঘটনা ঘটিয়েছিল।

সিপিএম-তৃণমূল একই মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এই দুই যুযুধান গোষ্ঠী ক্ষমতা ধরে রাখার আর ক্ষমতা অধিকারের লড়াইতে জনগণকে রাজনৈতিক দাবা খেলার বড়ে হিসেবে ব্যবহার করছে। ইতিহাস এদের ক্ষমা করবে কি? এই দুই দল মুসলিম তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তোষণের রাজনীতি করে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিচ্ছে। এর ফলে মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। এদিকে জনাব তহা সিদ্দিকি নাকি নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হতে চান? এইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলো— মেট্রো চ্যানেলে মুসলিমদের সভায় মমতা ব্যানার্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন— ''সিপিএম-বিজেপি গোপন আঁতাত হয়েছে। মুসলিম ভাইরা সতর্ক থাকবেন।'' এই সভায় ক্রিকেটে কলঙ্কিত নায়ক ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন এবং বর্তমানে লোকসভার কংগ্রেস সদস্য মহম্মদ আজাহারউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। মমতা এই সভার একদিকে যেমন মুসলিমদের কাছে বিজেপি-কে মুসলিম-বিরোধী বলে ইঙ্গিত করেছেন, অপরদিকে সিপিএম-কে হিন্দু সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করেছেন। মমতা কার্যত মুসলিমদের এই কথা বলে উস্কানি দিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন এ-রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনও কোনও নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-কে পশ্চিমবঙ্গের 'বাল ঠাক্‌রে' বলে অতীতে অভিহিত করেছিলেন। এদিকে মুসলিম ভোট পাবার জন্য সিপিএম মুসলিমদের তোষণ করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করে চলেছে।

একথা ঠিক সিপিএম ভোট পাবার জন্য যে কোনও সম্প্রদায়ের জন্য কাঁদতে দেরি করছে না— কেবল দরিদ্র হিন্দুদের জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলতে তাদের কি কষ্ট হয়? আজ এ-রাজ্যে মাওবাদীদের বাড়বাড়ন্তের জন্য দায়ী বুদ্ধদেব-বিমান বসু অ্যান্ড কোং। তাঁরা 'রাজনৈতিক-মোকাবিলার' নাম করে মাওবাদীদের আস্কারা দিয়েছেন। এখন ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরতে চাইছেন। জঙ্গলমহলের তথা রাজ্যের দরিদ্র জনজাতি তথা দরিদ্র মানুষদের জন্য বিগত ৩৫ বছরে কিছুই করেনি। এঁদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে 'মাওবাদী' নামক গোষ্ঠী বলবান হয়েছে।

রাজ্য রাজনীতি

মোদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণহীন সিট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'ক্লিনচিট' দিল বিশেষ তদন্তকারী দল (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশান টিম) বা সিট। সিট তাদের যে রিপোর্ট সম্প্রতি জমা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, গুজরাট দাঙ্গার প্রাথমিক তদন্তে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি যার জন্য নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সংবাদমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, সিটের চেয়ারম্যান এবং সি বি আই-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর আর কে রাঘবন সুপ্রিম কোর্টকে জমা দেওয়া সেই রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন ''এখনও অবধি ৩২টি অভিযোগের অনুসন্ধান করে এই প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। এই তদন্তের আওতায় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ছিল। এর মধ্যে কয়েকজন নিজেরাই সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম যে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সপক্ষে এমন কোনও প্রমাণ সাক্ষ্য নেই যাতে করে তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা আগামীদিনে নেওয়া যেতে পারে।'' তহেলকা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সূত্রানুযায়ী, ওই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে (যাঁরা স্বয়ং এই সত্য-প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে তাঁরা নির্দোষ) রয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশের নয়া চাল

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে সংখ্যাগুরু ইসলামিস্তানে পরিণত করিবার নীরব যুদ্ধ নূতন নহে। পাকিস্তান নামক একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠিত হইবার পর হইতেই হিন্দুস্থানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মুসলিমগরিষ্ঠ করিবার প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সম্মুখ যুদ্ধ নয়, অস্ত্র প্রয়োগেরও প্রয়োজন নাই। এই যুদ্ধ অভ্যন্তরীণ জনবিস্ফোরণের মাধ্যমে ভৌগোলিক সীমা বিস্তারের এক নয়া কৌশল।

এই কৌশলও নানা ধরনের। কখনও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হইতে ছলে-বলে-কৌশলে সেদেশের হত দরিদ্র মুসলমান জনগোষ্ঠীকে এদেশে অনুপ্রবেশ করানো; কখনও বা ওদেশের সমাজবিরোধী গুন্ডাদের মাধ্যমে ভয় দেখাইয়া এদেশে পাঠানো; কখনও বা দুষ্টচক্রের মাধ্যমে লোভ দেখাইয়া সীমা পার করানো। দুই দেশেই রহিয়াছে এই আড়কাঠির দল। ভারতে তো রহিয়াছে ধান্দাবাজ ভোট ভিখারী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ। ইহাদের কাছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াটাই প্রধান, তাহা বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্যেই হউক কিংবা অন্য কোনও পথে। এদেশে তাহাদের নাগরিক স্বীকৃতির সমস্ত বন্দোবস্তই ইহাদের দ্বারা করা হইয়া থাকে।

বিশ্ব ইসলামীস্তান গঠন করিবার জন্য তৎপর একদল উগ্র মৌলবাদী মোল্লা-মৌলবী আরও অনেক কৌশলই গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন আসন্ন প্রসবা মুসলমানদের এদেশের হাসপাতালে প্রসব করানোর বন্দোবস্ত করা। কারণ জন্মগ্রহণ সূত্রে নাগরিক বানাইবার ইহা একটি সহজ পথ। বাংলাদেশী-পাকিস্তানী নাগরিক পিতা-মাতার ভারতীয় সন্তানে আজ এদেশ ক্রমশই স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তান খেলা দেখিবার ছলে বৈধ পাসপোর্ট-ভিসা লইয়া এদেশে আসিয়া এদেশের মুসলিম জনারণ্যে মিশিয়া যাইবার কৌশল। তাহাদের খুঁজিতে এদেশের ভুল-ভুলাইয়া মুসলিম মহল্লাগুলিতে পুলিশ তল্লাশী চালাইতে গেলেই তথাকথিত মুসলিম-দরদী ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ ফোঁস করিয়া উঠিবে। সংসদে গলা ফাটাইয়া বলিতে থাকিবে—এটা অতি ভয়াবহ মানবিকাধিকার লঙ্ঘন। সংখ্যালঘুদের মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করা হইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর একটি বহুল প্রচারিত কৌশল হইল এদেশে মুসলমানদের জন্ম নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ না করা। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ চলিলেও এদেশের মুসলিমগণের নিকট জন্ম নিয়ন্ত্রণ নাকি পাপ। ইহাও একটি কৌশল।

এবার শুরু হইয়াছে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার আর একটি অপকৌশল। এবার লক্ষ্য পথ শিশু। কলকাতার ফুটপাতে অনুপ্রবেশকারীদের সংসার বেশ রমরমা চলিয়াছে—একথা সকলেই জানেন। এই শিশুদের অধিকাংশের পিতামাতাই অনুপ্রবেশকারী। ২০০৭ সালে তৎকালীন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য তাহাদের আইনসিদ্ধ করিবার জন্য একটি স্কীম তৈয়ারী করিয়াছিলেন। স্কীমটি হইল এই শিশুদের বার্থ সার্টিফিকেট বিলি করা। এই উদ্দেশ্যে একটি এন. জি. ও গঠিত হইয়াছিল। তাহাদের গালভরা কাজ ঘোষিত হইয়াছিল পথশিশুদের শিক্ষার আলো দেখানো। এই কাজে স্কুলগুলি বাদ সাধিয়াছিল। তাহারা বার্থ সার্টিফিকেট বিনা ভর্তি করিতে নারাজ। আইনজ্ঞ মেয়র তখন এই এন জি ও মারফৎ শুরু করিলেন বার্থ-সার্টিফিকেট বিলি-বাট্টা। কিন্তু আবার বাদ সাধিলেন বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকগণ। বলিলেন এই সার্টিফিকেট চলিবে না কারণ সার্টিফিকেটগুলিতে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারই নাই। ধর ধর করিয়া ছুটিলেন বর্তমান মেয়র। তিনি যে অন্যদলের, গঠন করা হইল পাঁচজনের একটি কমিটি। এই কমিটিই বেনিয়মের তদন্ত করিবে। কমিটিতে আছেন ডেপুটি মেয়র ফরজানা আলম। যে দুটি শিশুর পিতা এই ঘটনার বিরুদ্ধে ফরজানা আলমকে নালিশ জানাইয়াছিলেন, তাহাদের নাম ইয়ারকা আহমেদ (৬) ও শেহনাজ আলম (৭)।

সিপিএমের মেয়র অবৈধভাবে বৈধ নাগরিক গড়িতেছিলেন। এবার কী তৃণমূলের মেয়র বৈধভাবে অবৈধ নাগরিক গড়িবার সুচারু স্কীম করিবেন? মেয়র-ইন-কাউন্সিল (স্বাস্থ্য)-এর সদস্য অতীন ঘোষ সেই ইঙ্গিতই দিয়াছেন। অতএব যাহারা এই দেশকে উদার ধর্মীয় গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে রক্ষা করিতে চান তাহারা মেকী ধর্মনিরপেক্ষবাদী তৃণমূল হইতেও সাবধান।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

এই আমাদের পবিত্র ভূমি ভারতবর্ষ যে দেশের গৌরব গাথা গীত হয় দেবকণ্ঠ হতে—এ দেশে জন্ম নিয়েছে যারা তাদের মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটেছে এবং স্বর্গের দ্বার তাদের নিকট উন্মুক্ত। এ সেই দেশ যা অজানা অতীত থেকে আমাদের কাছে প্রিয় দেশজননী ভারতমাতা, যার নামের মহিমায় আমাদের অন্তরে প্রবাহিত হয় এক পবিত্র এবং স্বর্গীয় ভক্তির ফল্গুধারা।

—শ্রী গুরুজী

অর্থের চোরাচালান, সরকার চুপচাপ

তারক সাহা

সতর্ক করেছিলেন আদবানী। বিতর্ক দান বাঁধলো দেশের বেশ কয়েকজন প্রথম সারির নাগরিকের সুপ্রীম কোর্টের দায়ের করা মামলার মাধ্যমে। এই দলে রয়েছেন রাম জেঠমালানি, কে পি এস গিল, সুভাষ কাশ্যপের মতো মানুষ। বলা হচ্ছে গত ছয় দশক ধরে কমপক্ষে সাড়ে ২২ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশি বিভিন্ন ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে। হাওলা বা অন্য কোনও অনৈতিক উপায়ে এত বিপুল অর্থ দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে গত ছয় দশকে, অথচ এতে কোনও দোলাচল নেই সরকারের। পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ এতটাই বিশাল যে তা দেশের গড় আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জি ডি পি)-র অর্ধেক। ঠিক এই মুহূর্তে এত বিপুল অর্থের মালিক কারা তার হদিশ সঠিকভাবে জানা না গেলেও সরকারের কাছে যেসব তথ্য এসেছে তা জনসমক্ষে আনতে নারাজ কেন্দ্র সরকারের খোদ অর্থমন্ত্রী প্রণববাবু। তাঁর মতে এইসব তথ্য যদি সরকার ফাঁস করে দেয় তবে আগামীদিনে সরকারের পক্ষে ওইসব তথ্যসূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহে অসুবিধা হতে পারে। প্রণববাবুর এই তত্ত্ব মানতে নারাজ সুপ্রীম কোর্টের দুই বিচারক সুদর্শন রেড্ডি এবং এস. এস. নির্ঝরের ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁরা সরকারের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন এবং এই ব্যাখ্যায় সরকারের সততার ওপর প্রশ্ন তুলে দিল বেঞ্চ। উচ্চ আদালত সরাসরি সরকারী অ্যাটর্নিকে প্রশ্ন করেছে যে, নামের তালিকা প্রকাশ করতে সরকারের আপত্তি কোথায় এবং সরকার কোনও বিষয়টা লিচটেনষ্টাইন ব্যাঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে এই ছয় দশকে সরকারী উদাসীনতা, সরকারী আর্থিক আইনের ফাঁক ফোকর, সরকারী মন্ত্রী, আমলাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এত বড় কাণ্ড ঘটতে পারে না। আদালত তো এত বড় অর্থের পাচারকে অর্থের চৌর্যবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করেছে। প্রশ্ন উঠছে, এত বিপুল অর্থ-কীভাবে এলো এইসব আর্থিক মাফিয়াদের কাছে? বিভিন্ন মহলের মতে বিভিন্ন সরকারী কেনাবেচায় যে বিপুল অর্থের কমিশন হাতবদল হয়, কিংবা অবৈধ মাদক দ্রব্যের অবাধ বাণিজ্যই এত বিপুল অর্থের উৎসমুখ। কমিশন বা মাদক দ্রব্যের বাণিজ্যের অর্থ এদেশে আসে না, তা সরাসরি ওইসব ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন, উঠছে, এত বিপুল অর্থ কোন কাজে লাগছে? আশঙ্কা এই বিপুল অর্থ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহ দিতে কাজে লাগছে। শুধু তাই নয়, এই বিপুল কালাধন 'পার্টিসিপেটার নোটে'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিদেশী লগ্নীকারী সংস্থা এদেশের শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরের শীর্ষকর্তাদের মতে, দেশে যে ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ২০০৯-১০ সালে দেশের শেয়ার বাজারে লগ্নী হয়েছে তার অর্ধেকের বেশি বিদেশী প্রত্যক্ষ লগ্নী। মুশকিল হলো, এত বিপুল অর্থ বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি যে এদেশে লগ্নী করছে তার উৎসমুখ কোথায় বা তার কোনও ঠিকানা জিগ্যেস করা যাবে না। এইসব অনিয়মের, বেহিসেবী অর্থ জোগানের উৎসমুখে জানার বিষয়ে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তার পুরো কৃতিত্ব দাবী করতে পারে মনমোহন স্বীকৃত বাজার অর্থনীতি। নয়ের দশকে মনমোহন তাঁর উদার অর্থনীতির জন্য যা বাহবা কুড়িয়েছেন তার কুড়ি বছর বাদে তারই কু-প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

রাম জেঠমালানির দাবী, সুইস ব্যাংক উজার করে বিশাল পরিমাণ টাকা এদেশের শেয়ারবাজারে লগ্নী হচ্ছে তার গতিরোধ করতে সুইস ব্যাঙ্কগুলি যে অতিরিক্ত চার্জ বসাবার ব্যবস্থা করছে তার নথিপত্র তাঁর হাতে আছে। তাঁর মতে এ ব্যাপার দুদেশের সরকারের মধ্যে তথ্য বিনিময় হচ্ছে। তাঁর দাবী অচিরেই দেশের শেয়ার বাজারে আবার বড় ধরণের ধাক্কা আসার সম্ভাবনা প্রবল।

২০০৯ সাল থেকেই বিজেপি নেতা-নেত্রীরা এ বিষয়ে সরব। কিন্তু সেই সময়ে বিশেষ পাত্তা পায়নি বিজেপির দাবী। কারণ রাজনীতির 'গুড বয়' মনমোহনের তথাকথিত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বিজেপি-র সোচ্চার হওয়াকে খুব একটা আমল দেয়নি জনতা। কিন্তু 'ইউ পি এ' সরকারের দুর্নীতির বেড়ালগুলি একে একে ঝাঁপি থেকে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে পড়ছে। 'গুডবয়ের' ছবিটা একেবারেই মলিন হয়ে পড়ল যখন সরকার একের পর এক যেমন স্পেকট্রাম ২-জি, কালামাদি অ্যান্ড কোং-এর সি ডব্লু জি স্ক্যাম লোকের গোচরে এল।

আমাদের দেশে যে অর্থ 'পার্টিসিপেটার নোটের' মাধ্যমে লগ্নী হচ্ছে সেই অর্থের মালিক কে তা জানার কোনও ব্যবস্থা নেই। সেবিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য এসব সন্দেহজনক গতিবিধি (Speculative Trends)-র বিষয়ে কোনও কিছু তথ্য দেওয়া যাবে না। তবুও সেবির ওয়েবসাইট থেকে জানা যাচ্ছে যে, শেয়ার বাজারে লগ্নী ইতিমধ্যে ২০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইন্ডিয়ার আই পিও-তে বিদেশী আর্থিক সংস্থাগুলি ১.২ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নী করেছে যা কোম্পানির লক্ষ্যমাত্রার ২৪ গুণ। শুধু তাই নয়, 'পার্টিশিপেটরি নোটের' মাধ্যমে সিটি ব্যাঙ্ক, মেরিল লিঞ্চ, জয়সে ব্যাঙ্কেও লগ্নী করেছে যথাক্রমে ১ মিলিয়ন, ২ মিলিয়ন এবং ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা দেশীয় অর্থনীতির ৭২ শতাংশ অবৈধ আমানত বিদেশে গচ্ছিত। অনেক সময় বিদেশে কাঁচা টাকাও ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার হচ্ছে। মুম্বাই-র এক ইক্যুইটি সংস্থার কর্তার মতে দেশের এই বিপুল অর্থ চালানের অধিকাংশ অর্থ বিশেষ উড়ান বা চার্টার্ড উড়ানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এইজন্যই ইদানীং নিজস্ব উড়ানের চাহিদা এত বেড়েছে।

সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল যে, বিপুল অর্থের বিশেষ গন্তব্যস্থল হলো সুইজ্যারল্যান্ড, কারণ সেখানকার গোপনীয়তা আইন খুব কড়া। এদেশের এক বরিষ্ঠ আয়কর আধিকারিকের মতে সুইস সরকার তাদের গোপনীয়তা ভাঙতে রাজি, যদি দু'দেশের অপরাধ আইনের মধ্যে এই আর্থিক লেনদেনের বিষয়টা থাকে। কারণ সুইজারল্যান্ডে আয়কর ফাঁকি কোনও অপরাধ নয়। ভারতকে প্রমাণ দিতে হবে যে, লগ্নীকারীদের এই অর্থ অবৈধ অর্থ, লগ্নীকারীর অর্থ কোনও মাদক দ্রব্য পাচারের সঙ্গে যুক্ত বা অন্য কোনও অবৈধ লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রে দুই দেশের আইন বেশ কড়া।

২০০৯ সাল থেকেই বিজেপি নেতা-নেত্রীরা এ বিষয়ে সরব। কিন্তু সেই সময়ে বিশেষ পাত্তা পায়নি বিজেপির দাবী। কারণ রাজনীতির 'গুড বয়' মনমোহনের তথাকথিত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বিজেপি-র সোচ্চার হওয়াকে খুব একটা আমল দেয়নি জনতা। কিন্তু 'ইউ পি এ' সরকারের দুর্নীতির বেড়ালগুলি একে একে ঝাঁপি থেকে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে পড়ছে। 'গুডবয়ের' ছবিটা একেবারেই মলিন হয়ে পড়ল যখন সরকার একের পর এক যেমন স্পেকট্রাম ২-জি, কালামাদি অ্যান্ড কোং-এর সি ডব্লু জি স্ক্যাম লোকের গোচরে এল। দেখা গেল 'গুডবয়' লালু-মুলায়ম-মায়াবতীদের মাঝে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

অতি সম্প্রতি অপেক্ষাকৃত কম জানা ব্যক্তি হাসান আলি খানের নাম উঠে এসেছে। এই আলিখানের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাওলায় টাকা লেন-দেন ও কর ফাঁকি দেবার যে অভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত চলছে। আট বিলিয়ন ডলার বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে এই ব্যক্তির। আয়কর দপ্তর ৫০ হাজার কোটি টাকার আয়কর ফাঁকির নোটিশ দিয়েছে। ইতিমধ্যেই আয়কর দপ্তরের তদন্তের আগেই তার বিভিন্ন বেনামী লেনদেন সম্পত্তি সরিয়ে নিয়েছে। সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে তবে সেই ভূত তাড়াতে সর্ষের কী প্রয়োজন! এমনই অবস্থা মুম্বাই প্রশাসনের। সূত্র বলছে যে, হাসান আলির সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরের লোকজনের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা প্রচুর। মুম্বাই পুলিশের অনেক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে ওঠাবসা তার। সুতরাং আট বিলিয়ন ডলার বিদেশী ব্যাঙ্কে তার জমবে এতে অবাক হবার কী আছে?

রাম জেঠমালানির জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে বেশ বেকায়দায় ফেলেছে। সুপ্রীম কোর্ট প্রণববাবুর বক্তব্যকে খারিজ করে আগামী ৮ তারিখে আদালতকে যাদের নাম সরকারের তালিকাভুক্ত তাদের নাম জানতে বলেছে এবং তারা কীভাবে, কোথা থেকে এভাবে অর্থ রোজগার করেছে তার সবিস্তার বিবরণ চেয়েছে। সরকার তার বক্তব্য কীভাবে পেশ করে এবং সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে কী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয় তারই অপেক্ষায় রয়েছে মানুষ।

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবস ও কংগ্রেস

এন. সি. দে

প্রজাতন্ত্র দিবস কেবলমাত্র একটি সরকারী প্রশাসনিক দিবস নয়। কংগ্রেস ও তাঁর তাঁবেদারদের নিরাপত্তারক্ষীদের সুরক্ষা বলয়ে বসে সেনাবাহিনীর স্যালুট গ্রহণের দিবসও এটা নয়। এটা প্রজাদের সাধারণতন্ত্র দিসব, প্রজাতন্ত্র মানে প্রজাদের তন্ত্র বা শাসন। যে শাসন প্রজাদের দ্বারা, প্রজাদের জন্য এবং প্রজাদের শাসন। এই দিবসের তাৎপর্যই হলো প্রজাদের সোৎসাহ, উদ্দীপনাপূর্ণ অংশগ্রহণ। এই দিবস পালনের মধ্য দিয়ে প্রজাগণ তাদের দেশের প্রতি মমত্ব, স্বাভিমান ও জাত্যাভিমান প্রকাশ করে থাকে। সরকারের কর্তব্য হলো প্রজাদের এই মমত্ববোধ, স্বাভিমানবোধ ও জাতীয়তা-বোধকে সংগঠিত করে সারা বিশ্বকে, বিশেষ করে প্রতিবেশী সেইসব দেশগুলোকে নিজেদের সংঘবদ্ধ সংহতিকে প্রদর্শন করা যারা আমাদের একটি অংসহত বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসাবে ব্যঙ্গ করে। দ্বিজাতি তত্ত্বের বাহানা তুলে কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা একদিন জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ জাগ্রত করেছিল, বলেছিল হিন্দু ও মুসলমান— এই দুটি আলাদা জাতি। এই দ্বি-জাতি তত্ত্ব তুলে ধরে ভারতীয় জাতিতত্ত্বকে বিভক্ত করে দিয়ে দেশকে ভাগ করে দিয়েছিল যে কংগ্রেসীরা আজ তারাই ভারতবর্ষের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় জাতীয় সংহতির প্রতীক জাতীয় পতাকার সার্বভৌমত্ব সামগ্রিক ভারতীয় ভুখণ্ডে এখনও ব্রাত্য।

কংগ্রেস সরকার ও তার জোট -সঙ্গীরা প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানকে শুধুমাত্র একটি সরকারী অনুষ্ঠানে পরিণত করতে চায়। এক কংগ্রেসী নেতা একটি বাংলা টিভি চ্যানেলে জম্মুর যুবকদের কাশ্মীরে গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সমালোচনা করে বলেছেন, কাশ্মীরে সরকারী অনুষ্ঠানে তো জাতীয় পতাকা উত্তোলন হবে, তাই আবার জম্মু থেকে কাশ্মীর গিয়ে পতাকা উত্তোলন কি প্রয়োজন? হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে, কেবল কাশ্মীরের জন্যই প্রয়োজন আছে। কারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রজাতন্ত্র দিবস একটি জনগণের উৎসবে পরিণত হয়েছে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য। কংগ্রেস ও বামপন্থীরা একথা যতই অস্বীকার করুক দেশের আমজনতা এটা ভাল করেই জানে যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাই ভারতীয় সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের একমাত্র গ্যারান্টি। মুসলিম ভোট ভিখারীদের কাছে কথাটি যতই সাম্প্রদায়িক হোক না কেন— কথাটি সর্বাংশে সত্য। অন্যান্য সমস্ত প্রদেশে সমস্ত স্কুল-কলেজ-ক্লাবসহ সমস্ত সংগঠনে এই দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় বীরদের স্মরণ ও সম্মান জানানো হয়। কিন্তু গত ৬২ বছরেও কংগ্রেস কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রতি মমত্ব গড়ে তুলতে পারেনি। উল্টে ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে মুসলিমদেরকে জাতীয়তাকে সারা দেশে তোষণ করে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্কের অধীন রাখতে কাশ্মীরে জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপকে দমন করাতো দূরের কথা, মদতই দিয়ে গেছে।

আজও দিয়ে চলেছে সমানে। এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কেন্দ্রের কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কাশ্মীর সরকারের সাহায্যে জাতীয় পতাকা-ধারীদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তার সঙ্গে শুধু ইংরেজ আমলেরই তুলনা করা চলে। জাতীয় পতাকা হাতেই প্রাণ দিয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার অজুহাতে কাশ্মীরের রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে তোষণ করতে সারা দেশ থেকে আসা যুব সম্প্রদায়কে নানানভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। মধ্যরাতে লাইট নিভিয়ে দিয়ে ঘুমন্ত যুবকদের ট্রেন বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে। যে ধরনের কাজ যে কোন ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রেই শুধু হয়ে থাকে। জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে হাজার হাজার সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষ থেকে সেনাবাহিনী জাতীয় পতাকাবাহীদের উপর আক্রমণ করেছে। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে কাশ্মীরের রাষ্ট্রবিরোধী যুবকদের শায়েস্তা করতে কিংবা বাংলা-বিহার-ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড, ছত্তিসগড়, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে থাকা মাওবাদীদের শায়েস্তা করতে কেন্দ্রীয় সরকার এত তৎপর নয় কেন? তাহলে এদের পিছনে কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেসীদের মদত আছে?

যদি তা না থাকত তাহলে তৃণমূলের সহযোগী মাওবাদী বুদ্ধিজীবীদের ভারত সরকারের তরফ থেকে এবছর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রীয় সম্মান পদক পদ্মশ্রী প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হোত না। এ রাজ্যের রাজ্যপাল এই দুর্বুদ্ধি জীবীদের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, কোনও আদর্শের বিচারেই হিংস্র রাজনীতিকে বুদ্ধিজীবীদের উচিৎ নয় সমর্থন করা। হিংসায় বিশ্বাসী মাওবাদীদের প্রতি মদতদাতা একদল দুর্বুদ্ধি জীবীদের, প্রতিই ছিল তার ইঙ্গিত। রাজ্যপালের এই উপদেশে এই দুর্বুদ্ধি জীবীদের হৃদয়ের পরিবর্তনতো হয়ইনি, উপরন্তু তারা রাজ্যপালকে আক্রমণ করেছেন এই বলে যে রাজ্যপালের উচিৎ ভেবে দেখা— তাদের সমর্থনের কারণ অর্থাৎ রাজ্যপালেরও উচিৎ মাওবাদীদের সমর্থন করা। শঙ্খ ঘোষ রাজ্যপালকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন এই সাংবাদিক সম্মেলনে। এই সম্মেলন ছিল মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত বিনায়ক সেনের মুক্তির দাবীতে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হিংসায় বিশ্বাসী মাওবাদীদের সমর্থক এক বুদ্ধি জীবী শঙ্খ ঘোষকে ভারত সরকার পদ্মশ্রী পুরস্কার দিয়েছেন। তিনি নিশ্চিতভাবে পেয়েছেন পরিবর্তনের রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত মমতার অনুমোদন। কারণ এই দুর্বুদ্ধি জীবীও যে একজন পরিবর্তনপন্থী। কোন্ পরিবর্তন আসবে এই মাওবাদী দুর্বুদ্ধি জীবীদের মাধ্যমে? পশ্চিমবাংলার ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে মশগুল মমতা কাদের খপ্পরে পড়েছেন— একথা ভেবে দেখার ফুরসতও তার নেই। কিন্তু ভোটদাতাদের একথা অবশ্যই ভেবে দেখা উচিৎ।

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালেই ঘটে গেছে কেরোসিন-ডিজেল ভেজালকারী মাফিয়াচক্রের হাতে উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা। ঘটে চলেছে একের পর এক দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারী। অর্থনীতি চলে গেছে দেশী-বিদেশী দালাল পুঁজিপতিদের হাতে। বাজারের নিয়ন্ত্রণ আর সরকারের হাতে নেই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের অসহায়তা ও অপারগতার কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেসী প্রশাসনে দুর্নীতি যখন তুঙ্গে তখনই কংগ্রেস সরকার ভিজিল্যান্স কমিশনের চেয়ারম্যান পদে বসিয়েছেন এক দুর্নীতিগ্রস্তকে। বিভিন্ন দুর্নীতি ইস্যুতে কংগ্রেস সরকার নিত্য সুপ্রীম কোর্টের ভর্ৎসনা শুনছে। এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের মানুষ কি শিক্ষা পেলেন! দুর্নীতিগ্রস্ত, রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পরিপোষক কংগ্রেস দলের হাতে কী দেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সুরক্ষিত?

শ্মশানের শান্তি

(১ পাতার পর)

সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'তার ভাইঝিরা কোনওরকম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তারা রাস্তার ধারের দোকানে আলু-ভাজা (পটেটো চিপ) এবং মাছ বিক্রি করত। তাতে পরিবারের খরচ-খরচায় একটু সাহায্য হোত।'

মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে বলেছেন, 'কেন এমন ঘটনা ঘটল তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করার মতো সাহস কেউই দেখাতে পারেনি। এর ফলে পরস্পর বিরোধিতা তৈরি হচ্ছে'।

ওমর আবদুল্লা যাই বলুন না কেন, তার দ্বিচারিতা এখানে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তিনি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করলেও উগ্রপন্থীদের দ্বারা জনসাধারণের উপর অত্যাচার নিয়ে নাম করে কোনও প্রতিবাদ জানাননি। যদিও পুলিশ সুপার বলছেন, হত্যাকারীরা 'লস্কর এ তৈবা' জঙ্গি এবং দু'জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। রহস্য এখানেই। ঘটনা হলো, বিক্ষোভের সময় আত্মরক্ষার্থে সেনাবাহিনী গুলি চালালে বা সেক্ষেত্রে কেউ নিহত হলেই উপত্যকাকে অস্থির করে তোলা হয়। সেনাবাহিনীর উপর দোষারোপ করা হয়।

সঙ্ঘের সম্পর্ক অভিযান

(১ পাতার পর)

থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি এই জনসম্পর্ক অভিযান চলবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং অন্যান্য সহযোগী সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনে সক্রিয় স্বয়ংসেবকরা এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন। প্রায় প্রতিটি গ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

পুস্তিকা দুটির প্রচ্ছদ বহুবর্ণের ও আকর্ষণীয়। প্রচার পুস্তিকাটির (বিনামূল্যে) মলাটের তিনটি পৃষ্ঠায় বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ও প্রামাণ্য চিত্র রয়েছে। সেখানে ফুটে উঠেছে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা এবং সেইসঙ্গে দেশবিরোধী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের কিছু খণ্ড চিত্র।

এই সময়

আর্থিক দুর্নীতির সুযোগ

সম্প্রতি দেশব্যাপী কয়েকটি বৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি যেমন টু-জি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ ইত্যাদির পরে দেশবাসীর মধ্যে যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে তা হলো স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আর্থিক সমৃদ্ধি নাকি অর্থনৈতিক দুর্নীতির সমৃদ্ধি — কোনটা বেশি হয়েছে? হালফিলের যা খবর, তাতে অর্থনৈতিক দুর্নীতির দিকেই যে পাল্লা ভারী হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপরেও সাম্প্রতিকতম একটা দুর্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, কারণ দেশের অর্থনৈতিক গোয়েন্দা শাখা (ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট - ইণ্ডিয়া) যে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন প্রতিবেদন (সাসপিসিয়াস ট্রানজাকশান রিপোর্ট) প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদীরা ব্যক্তিবিশেষের সেভিংস অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন চালাচ্ছে। এর জন্য যার সেভিংস অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে তাকে প্রয়োজনীয় অর্থও দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দেশের আর্থিক দুর্নীতির সুযোগ নিচ্ছে তারা।

একমাত্র তিনি

মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে যেমন উন্নয়নের মুখ, তেমনি অন্যদিকে আর্থিক-দুর্নীতির ছোঁয়াচ বাঁচানো উজ্জ্বল মুখের দৃষ্টান্ত। হতোদ্যোম কংগ্রেসীকুল এই মুখের পেছনে অনেকদিন ধরেই 'মুখোশ' আবিষ্কার করার একটা নিদারুণ প্রয়াস চালাচ্ছিল। কিন্তু মুখে এবং মুখোশে (অর্থাৎ মনে) তিনি যে এক এবং অদ্বিতীয় সেটা প্রমাণ হয়ে গেল গুজরাট নরেশ লোকায়ুক্ত বিলকে সমর্থন করায়। আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে একবার বলেছিলেন, সুশীল সমাজের মানুষজন রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করলে তা দেশের পক্ষে আখেরে ভালই হবে। ঠিক একইভাবে মানবাধিকার কর্মী থেকে বুদ্ধিজীবী মানুষজন মিলেই দুর্নীতির পায়ে বেড়ি পরাতে লোকায়ুক্ত বিল তৈরি করেছেন। কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট শাসিত এবং সমর্থিত কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাহস হয়নি, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ্যেই সমর্থন জানিয়েছেন লোকায়ুক্ত বিলকে।

সমৃদ্ধ দেশ সমর্থ নয়

ভারতবর্ষ আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ, কিন্তু সমর্থ নয়। কারণ দেশের কিছু মানুষ কুক্ষিগত করে রেখেছে প্রভূত পরিমাণ অর্থ। যাকে বলা হয়, কালো টাকা। যা গচ্ছিত থাকে সুইস ব্যাঙ্কে। সম্প্রতি আর্থিক অনিয়মের প্রশ্নে সুইস ব্যাঙ্কের নাম অনিবার্যভাবে এসে পড়ার পাশাপাশি প্রকাশ্যে এসেছে তাদের ২০০৬ সালের একটি রিপোর্ট। যাতে দেখানো হয়েছে সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৪৫৬ বিলিয়ন ডলার রয়েছে। তার ধারকাছে থাকা দেশগুলি হলো রাশিয়া (জমা ৪৭০ বিলিয়ন ডলার), ইংল্যাণ্ড (৩৯০ বিলিয়ন ডলার), ইউক্রেন (১০০ বিলিয়ন ডলার), চীন (৯৬ বিলিয়ন ডলার)। বলাই বাহুল্য, বিগত ৫ বছরে আরও বহু কোটি টাকা জমা পড়েছে সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের অ্যাকাউন্টে। কিন্তু দেশ স্বাবলম্বী হয়নি। বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে বিপুল ঋণের বোঝা তারই প্রমাণ। দেশবাসীর অনিবার্য প্রশ্ন, দেহের সব রক্ত মুখে জমা হলে তাকে কি সু-স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায়?

সাপের দু'পা

স্পর্ধিত বঙ্গবাসী অহরহই সাপের পাঁচ পা দেখিয়ে এবং দেখে থাকেন। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানীরা সত্যিই সাপের দু'পা (মানুষেরই মতো?) দেখলেন লেবাননে। অবশ্য সাপটিকে চাক্ষুষ দর্শনের দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁদের হয়নি। 'মাত্র' ৯৫০ লক্ষ বছরের পুরনো লেবাননস্থিত সাপের জীবাশ্ম উদ্ধার করে তাঁরা বলছেন, ওই সাপের দেহের পেলভিসের সঙ্গে দুটি টিনি (ক্ষুদ্র) পায়ের হাড়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, সাপের উদ্ধার হওয়া ওই জীবাশ্মটি সেই সময়কার, যখন সাপ তার পূর্বপুরুষ সরীসৃপের মতো অগ্রপদ দুটিকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেনি।

নতুন বোতল, মদ পুরনো

সম্প্রতি খুনের অভিযোগে পাকিস্তানের পুলিশ মার্কিন কূটনীতিক রেমন্ড অ্যালেন ডেভিসকে গ্রেপ্তার করায় কূটনৈতিকভাবে একটু অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। কারণ, আমেরিকার গোঁসা হওয়ায় তারা পাকিস্তানের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের সব ধরনের কথাবার্তাই বন্ধ করে দিয়েছে। আর এই অবস্থায় চিরদিন তারা যা করে থাকে এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। পাক বিদেশমন্ত্রী এস এম কুরেশি অকস্মাৎ ধুয়ো তুলেছেন কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাক কথাবার্তায় কাশ্মীরের মানুষকেও তৃতীয় পক্ষ হিসেবে যুক্ত করতে হবে। পাকিস্তানের এই দাবি নতুন নয়। কাশ্মীরে অশান্তি জিইয়ে রেখে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টিতে তাদের বরাবরের দোসর আমেরিকা। বন্ধুর মান ভাঙ্গাতে ভরসা সেই পুরনো মদ-ই, তবে বোতলটা নতুন।

ভারি তেতো

বাজারের ব্যাগ ঝুলিয়ে বাজার করতে যাওয়া জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নবান এক বৃদ্ধের কাছে— 'আচ্ছা মশাই, উচ্ছেটা আজকাল বড্ড বেশি তেতো লাগছে কেন বলুন তো।' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন অশীতিপর সুগারের রোগী বৃদ্ধ মানুষটি— 'ইয়ার্কি হচ্ছে! উচ্ছে তেতো না হয়ে রসগোল্লার মতো মিস্টি হবে নাকি?' পাশ থেকে সদ্য বিবাহিত জনৈক যুবকের টিপ্পনি — 'বুঝলেন না দাদু! উচ্ছে তো এমনিতেই তেতো, তার ওপর এহেন দাম (৮০/৯০ টাকা কেজি) তেতোর মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে নিদারুণভাবে।'

আতিথি কলম

অসীমানন্দের জবানবন্দী সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ

অলোক তোমর

আদালতে যেভাবে অসীমানন্দ নিজের দোষ কবুল করেছেন তাতে একজন শিক্ষিত মানুষ একটা স্কুল পড়ুয়ার মতো নিজেকে কীভাবে কবুল করতে পারে তা নিয়েই একদিকে যেমন প্রশ্ন উঠেছে তেমনি এর মাধ্যমে পাকিস্তান যেন হাতে লটারি পেয়ে গেল।

অসীমানন্দের দেওয়া বয়ানের ভিত্তিতে সরকার পক্ষ বলে বেড়াচ্ছে, অসীমানন্দ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। ঠিক এটাই পাকিস্তান চাইছিল যে, তাদের দেশে যেমন হাফিজ সঈদ রয়েছে তেমনই কাউকে শিকার হিসেবে ভারতে যদি পাওয়া যায়। অসীমানন্দকে বলির পাঁঠা সাজিয়ে সি বি আই কতটা সফল হবে, আর এতে কোন রাজনৈতিক দল লাভবান হবে তা তো পরে বোঝা যাবে। কিন্তু পাকিস্তান হালফিল অসীমানন্দের বয়ানের দস্তাবেজ, আর তদন্তের কাজের ফলাফল জানতে চাইবে। পরে পাকিস্তান অসীমানন্দকে তাদের হেফাজতে চাইবে। যখন আমরা ২৬/১১ মামলায় হাফিজ সঈদ আর ডেভিড হেডলির প্রত্যর্পণ চাইব, পাকিস্তানও তেমনি অসীমানন্দকে চাইবে।

অসীমানন্দ যদি দোষী সাব্যস্ত হন তবে তাঁর সাজা পাওয়াটা অবশ্যই নিয়তির খেলা। কিন্তু এক বন্ধ ঘরে বিচারক দীপক ভবান আর তাঁর স্টেনোর সামনে গৃহীত বয়ান সরকার তার ভক্ত এবং অনুগত এক পত্রিকায় ফাঁস হয়ে যাওয়া তথ্যকে যেভাবে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখিয়েছে তাতে আর যাই হোক, পাকিস্তানের হাতে একটা রক্ষাকবচ এসে গেল, যার সাহায্যে পাকিস্তানের দোষ পঞ্চাশ শতাংশ হাল্কা হয়ে গেল।

এখন অসীমানন্দ এবং হাফিজ সঈদের মধ্যে একটা তুলনাত্মক আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। অসীমানন্দ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আর এ বিষয়ে দুই পক্ষের কেউ অস্বীকার করছে না। হাফিজ সঈদ হলো ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-এ-তৈবার সংস্থাপক। যখন থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং আমেরিকা এই সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করল, তখন থেকেই সংগঠনটি তার পকেটে করে ঘুরছে। বয়সে অসীমানন্দ আর হাফিজ সঈদের মধ্যে বড় একটা ফারাক নেই, তবুও হাফিজ সঈদ গত দশ বছরে বড় বড় খুনের সঙ্গে যুক্ত এবং ভারত সরকার বারবার পাকিস্তানের কাছে অভিযোগ জানালেও হাফিজ সঈদ পাকিস্তানের কাছে এক নিরপরাধ ও পবিত্র ব্যক্তি।

হাফিজের বক্তব্য হলো, বিভাজনের সময়ে যখন তার পরিবার সিমলা থেকে লাহোরে যাচ্ছিল, তখন মোট ৩৬ জন লোকের মৃত্যু হয়। এই বিষয়ে কোনও তথ্য নেই যে ওই মৃতদের মধ্যে কতজন তার পরিবারের সদস্য ছিল। বিভাজনের বিষয়ে যদি বদলার রাজনীতি চলতে থাকে তো পাকিস্তান আর ভারতে লাশে লাশে ছয়লাপ হয়ে যাবে। যদি দু'দেশেরই লোকক্ষয় হয়ে থাকে তবে তো দু'দেশেই খুনীরা রয়েছে।

অসীমানন্দের বিষয়ে তো প্রমাণ হয়নি যে ভারতে আতঙ্কবাদী ঘটনায় তিনি কতটা লিপ্ত। এখনও অবধি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও চার্জশীট পেশ হয়নি। কেবল সংবাদপত্রের খবরের ভিত্তিতে তো কোনও মোকদ্দমা চলতে পারে না। হাফিজ সঈদের বিরুদ্ধে কেবল একটা নয়, এমন দু'ডজন মামলা রয়েছে যা প্রমাণ করে ২৬/১১র আগে বা পরে যাতে তার সক্রিয় যোগাযোগ রয়েছে। যদি ভারত পাকিস্তানের কাছে শত শত নিরপরাধ মানুষের হত্যালীলায় যুক্ত অপরাধীকে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ দিয়ে চেয়ে থাকে, তাতে অপরাধ কোথায়? সমঝোতা এক্সপ্রেসের ঘটনার আড়ালে কীভাবে পাকিস্তান তার পাপকে ঢাকবে? এরকম ঘটনা কেবল ভারতেই ঘটে থাকে, যেখানে দেশের সবচেয়ে বড় একটা শহরে খুনীরা ঢুকে দু'শোরও বেশি মানুষকে অবলীলায় হত্যা করে। আক্রমণকারীরা এক পাঁচতারা হোটেলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এদের একজনকে পাকড়াও করে তদন্তকারী অফিসার এবং বিচারকের সামনে হাজির করে তার দেওয়া সাক্ষ্য নেওয়া হয়। পাকিস্তান ধৃত আসামী, বিচারক ও তদন্তকারী অফিসারদের তাদের দেশে তলব করলেও ভারত তার কোনও প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। পাকিস্তান যখন বে-শরম, ভারতের তখন আশ্চর্যজনক ও আপত্তিকর সদাশয়তা। পাকিস্তান কেবল একবারই এমনটা করল না। আণ্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিম, পাকিস্তানের করাচি শহরে তার ঠিকানার সঙ্গে ফোন রেকর্ডিং সহ আরও প্রমাণাদি সম্ভবত ১৮ বার পেশ করা হয়েছে। পাকিস্তান উত্তরে বলে আসছে, পাকিস্তানে দাউদ থাকে না। দাউদের ভাই নুরা গ্যাংওয়ারে মারা গেছে, দাউদের কন্যার বিয়ে হয়েছে সে দেশের প্রখ্যাত ক্রিকেটারের ছেলের সঙ্গে। দাউদের সুরক্ষায় নতুন বাংলো দেওয়া হয়েছে। ঘর বদলানোর ছবি সেখানকার সংবাদপত্রে ছাপা হলেও পাকিস্তানের অকপট স্বীকারোক্তি যে দাউদ সেদেশে নেই।

পাকিস্তানের নেতাদের এরকম বিচিত্র আচরণের কারণে ভারতে মেহেন্দি হাসান, গুলাম আলি ও নুরজাঁহার মতো শিল্পীরা ভারতীয় জনতার বিরাগভাজন, ফলে ক্ষতি হচ্ছে দু'দেশেরই। এই ক্ষতিপূরণ হবার নয়। এতে অবশ্য হাফিজ সঈদ, জারদারি বা গিলানীদের কিছু যায় আসে না। জানি না পাকিস্তানে কীরকম জেহাদ চলছে, তবে ওখানে যা ঘটছে বা ঘটানো হচ্ছে তা কোনওভাবেই জেহাদ নয়।

সমঝোতা এক্সপ্রেসের তদন্ত শুরু করেছিল হরিয়ানা পুলিশ এবং পরে তা রেলওয়ে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়। সি বি আইও নিজের মতো করে যে তদন্ত চালায় তাতে উঠে আসে এই হামলায় আই এস আই এবং ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন যুক্ত।

এখন অভিনব ভারত আর অসীমানন্দের যুক্ত থাকার বিষয়ে যদি কোনও তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় তো তদন্তকারী সংস্থা নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়াতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানকে এখন বলার সময় এসেছে যে, বেনজির ভুট্টোর হত্যাকাণ্ডের ফাইল ভারত কখনও চায়নি, কিংবা আবদুল কাদির খানের পারমাণবিক বোমার ফর্মুলা কেনার বিষয়ে কোনও তথ্য ভারত চায়নি। তখন আমাদের দেশের তদন্তকারী সংস্থা দেশের অভ্যন্তরে যে তদন্ত চালাচ্ছে তাতে যেন পাকিস্তান দখলদারি না করে। সমঝোতা এক্সপ্রেস কেবল পাকিস্তানের সম্পত্তি নয় বরং এটা দু'দেশেরই যৌথ সম্পত্তি। পাকিস্তান কোনও হাবিলদার পাঠিয়ে ফাইলপত্তর দেখে নিতে পারে।

হরিয়ানার পুলিশ তো প্রথমে উর্দুতে ফাইল লিখত। কারণ এরকমটাই এখানকার রেওয়াজ। অসীমানন্দ আর হাফিজ সঈদকে একই তুলাদণ্ডে মাপা ঠিক নয়। ভারতে যে মুসলিম মারা গিয়েছে তারা ভারতীয় নাগরিক আর এদের বিরুদ্ধে যে কোনও অন্যায় অপরাধের জবাবদিহি ভারতই করবে।

('সম্মার্গ'-এর সৌজন্যে)

অসীমানন্দের দেওয়া বয়ানের ভিত্তিতে সরকার পক্ষ বলে বেড়াচ্ছে, অসীমানন্দ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। ঠিক এটাই পাকিস্তান চাইছিল যে, তাদের দেশে যেমন হাফিজ সঈদ রয়েছে তেমনই কাউকে শিকার হিসেবে ভারতে যদি পাওয়া যায়।

অ ফ রকম

রামচরিতমানস-এর উর্দু অনুবাদে নিবেদিত নাজনিন

কিরণশঙ্কর মৈত্র।। বাইশ বছরের নাজনিনের জন্ম এক নিরক্ষর তাঁতী পরিবারে। তিনি তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এর উর্দু অনুবাদে নিয়োজিত। অযোধ্যা এবং বাবরি মসজিদ বিতর্কে তিনি আদৌ মনোনিবেশ না করে বলেন— হাইকোর্টের রায় যা-ই হোক না কেন, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে— ভগবান রামের জন্মস্থান অযোধ্যা। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন— রামচরিত মানস-এর উর্দু অনুবাদের মাধ্যমে।

নাজনিন

মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠের এক উজ্জ্বল ছাত্রী নাজনিন। তিনি জানান— রামচরিত মানসের সুন্দরকাণ্ড পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করেছেন এবং আগামী মাস দুয়েকের মধ্যে তার অনুবাদ-কর্ম সমাপ্তির আশা রাখেন। নাজনিন এর আগে গোস্বামী তুলসীদাসের হনুমান চালিশার অনুবাদ করেছেন এবং করেছেন দুর্গা স্তোত্রের-ও উর্দু অনুবাদ। নাজনিনের মতে— মুসলমানদেরই এগিয়ে এসে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ করা উচিত আদালতের রায়ের অপেক্ষা না করে। ইসলাম ধর্ম কখনও বিতর্কিত স্থানে মসজিদ নির্মাণে সম্মতি দেয় না। শ্রীরাম শুধু হিন্দুদের নন, তাঁর পূত চরিত্র সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই অনুপ্রেরণা-সূত্র।

নাজনিন প্রেরণা পান মোগল যুগের লেখক ও স্কলার আবদুল কাদির বাদায়ুনীর মতো ব্যক্তিত্বের কাছে যিনি আরবি ও পার্শি ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে। বারাণসীর লাল্লাপুরায় নাজনিনই একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি।

মেঘালয়ে গারো-রাভা সঙ্ঘর্ষ দায়ী কে?

জে পি রাজখোয়া

মেঘালয় রাজ্যের ২০১১-এর শুরুটাই হলো মৃত্যু, হত্যা ও রক্তপাত দিয়ে। পূর্ব গারো পার্বত্য জেলায় রাভা এবং গারো জনজাতির লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক গোষ্ঠী সঙ্ঘর্ষে নিহত ২৭ জন। বেশিরভাগই রাভা সম্প্রদায়ের। এছাড়াও ১৫৫০টি বাড়ি অগ্নিদগ্ধ এবং ভস্মীভূত। ৩২টি গ্রামের পঞ্চাশ হাজার মানুষ প্রচণ্ড শীতে গৃহহীন। এদেরও অধিকাংশই রাভা সম্প্রদায়ের। সাময়িকভাবে অসমের পাঁচিশটি এবং পূর্ব গারো পার্বত্য জেলায় ২৭টি ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে গারোদের ত্রাণশিবির অসমে ছটি এবং পূর্ব গারো পার্বত্য জেলায় রাভাদের জন্যই দুটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।

পূর্ব গারো পার্বত্য জেলার ডি সি-র মতে গত ৪ জানুয়ারি পার্বত্য জেলায় দুটি পুলিশ-জীপ এবং কয়েকজন গারো যুবককে রাভা সম্প্রদায়ের লোকেরা আক্রমণ করেছিল। তা থেকে গোষ্ঠীসঙ্ঘর্ষ ভয়ঙ্কর চেহারা নেয়। এখবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম। তুরা জেলা থেকে সংবাদমাধ্যম সূত্রে প্রকাশ রাভা জনজাতিরা সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আর্থিক অবরোধ করেছিল। সে সময় ক্রীসমাসের (২৫ ডিসেম্বর) প্রাক্কালে চার্চে বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়া একটি গাড়িতে হামলা করেছিল। পরে আবারও এক পিকনিক-পার্টির ওপর হামলা করে মোটরবাইক পুড়িয়ে দেয়। আরোহীরা কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়। গত ২ জানুয়ারি ওই হামলার বদলা নিতেই রাভাদের উপর গারোরা চড়াও হয়েছিল।

এক যৌথ স্মারকলিপিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গত ১৫ জানুয়ারি উপরোক্ত সংবাদের সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন— গারো রাভা পীস কাউন্সিল-এর সভাপতি সিকরাম সাংমা এবং সম্পাদক জিতেন্দ্র রাভা।

"এখানেই কিছু রহস্য দানা বেঁধেছে। যেমন— ওই ম্যারেজ পার্টি এবং চার্চের ফাদার কে ছিলেন, কেন তাদের কোনও পরিচয় এখনও অবধি প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়াও একটি খবর রটানো হয়েছিল যে, একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজককে আক্রমণ করা হয়েছিল। তাঁর পরিচয়ও কেউ জানেন না। কার মোটরবাইক আক্রমণ করা হয়েছিল? কারা মেঘালয় পুলিশের দুটো জীপ আক্রমণ করেছিল? অপরাধীদের কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি? কেনই বা তাদের পরিচয় জানানো হয়নি? গারো পিকনিক-পার্টিতে যারা ছিল তাদেরকে লুটপাট কে বা কারা করেছিল? রবিবার (২ জানুয়ারি) রাত্রিতে রাভাদের দোকান লুট, হাতিমারা গ্রামে দুটি রাভা জনজাতিদের বাড়িই বা কারা বিনা প্ররোচনায় পুড়িয়ে দিল? এই স্ফুলিঙ্গ থেকেই কি হিংসার দাবানল নির্গত হয়েই গণহত্যার ঘটনা ঘটে গেল? এসব ঘটনায় প্ররোচনা যুগিয়েছিল কারা?

"এসকল প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করলে এরকম বলা যেতে পারে যে, এই ঘটনায় চার্চ, উগ্রপন্থী গোষ্ঠী, বাংলাদেশী মুসলমান, মুখোশধারী এন জি ও সমূহ, ছদ্ম-ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী এবং মানবাধিকার রক্ষাকারী সংস্থাগুলো, স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদ্‌রা এবং মেঘালয়ের ধর্মান্ধ ক্রীশ্চানগোষ্ঠী ওই জঘন্য গোষ্ঠী সঙ্ঘর্ষে সংযুক্ত। একজন কুখ্যাত বাংলাদেশী মুসলমান— নাম মহম্মদ শেখ শাহ আলম (পূর্ব গোয়ালপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক)-কে এই হিংসায় সক্রিয়ভাবে উস্কানি দিতে দেখা গেছে বলেই খবর।" প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপিতে গারো-রাভা শান্তি কমিটিই একশ্রেণীর র‍্যাডিক্যাল চার্চ নেতাদের সঙ্গে ক্রীশ্চান উগ্রবাদী দল 'অচিক ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়র কাউন্সিল এবং গারো ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফোর্স'-এর ঘনিষ্ঠ আঁতাতের অভিযোগ তুলেছে। মিডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে এরাই পূর্ব গারো পার্বত্য জেলায় রাভা জনজাতিদের গ্রাম আক্রমণ করেছিল। এছাড়া তারা মেঘালয় সংলগ্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার গ্রামেও এ কে ৪৭ রাইফেল সহ আক্রমণ চালিয়েছিল। গারো-রাভা পীস কমিটি অভিযোগ করেছে যে যেসকল বাংলাদেশী মুসলমান গারো জনজাতির মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসবাস করছে— তাদের লুব্ধ গৃধ্র দৃষ্টি রয়েছে রাভা হিন্দুদের উর্বর কৃষিজমির দিকে। তারা ওই রাভাদের গ্রাম থেকে উৎখাত করতে চায়। যাতে সহজেই জমি-দখল করা যায়। আরও অভিযোগ, "ওই মুসলমানরা গারো-খৃস্টান, মুসলমান এবং অ-রাভা জনজাতিদেরকে সম্মিলিত করে এক যৌথগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। তারাই গারোদের রাভাদের গ্রাম জ্বালাতে সবরকম সাহায্য সহযোগিতা করেছে।"

আকাশের নীচে রাভা-শিশুরা প্রচণ্ড শীতে ঘরছাড়া।

"গারো-রাভা পীস কমিটি চার্চের দিকেও আঙুল তুলেছে— হোস্টাইল— চার্চ-এর মিশনারী মিশন ওই এলাকায় বহুমুখী আগ্রাসী প্রকল্প চালাচ্ছে। ক্রীসমাস-এর আগেও পরে রাভাদের বাড়ি বাড়ি আগ্রাসী প্রচার করে। রাভারা এসব পছন্দ করে না। চার্চের এই হোস্টাইল (শত্রুতাপূর্ণ) ভূমিকার কারণেই ২০০৫-এ ডিমাসা-কার্বি সঙ্ঘর্ষ এবং ২০০৯-এ ডিমাসা-জেমি (নাগা) সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ গোষ্ঠী সঙ্ঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এটা সবাই প্রত্যক্ষ করেছি। বর্তমানের গারো-রাভা সঙ্ঘর্ষও সেই একই যোজনার অঙ্গীভূত। সব মিলিয়ে এই মতোই জোরদার হচ্ছে। সব মিলিয়ে রাভা-জনজাতিদের গ্রামের দশটি মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ একটি চার্চের গায়েও কোনও আঁচড় লাগেনি।"

গারো-রাভা পীস কমিটি আরও একটি উদাহরণ এব্যাপারে দিয়েছে— মৌলবাদী গারো খৃস্টানরা গত বছরের ৩০ অক্টোবর রাভা-হিন্দুদের গ্রাম উইলিয়াম নগর আক্রমণ করেছিল। গারো পাহাড়ে সাধারণ নির্বাচনেরও বিরোধিতা করেছিল। বাস্তব ঘটনা হলো, মেঘালয় রাজ্যে ৮৫ শতাংশ গারো'ই খৃস্টান। এখানও যে সকল 'গারো' হিন্দু রয়ে গেছে তারা এবং রাভারা মেঘালয়ে সংখ্যালঘু। সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের (পড়ুন খৃস্টানদের) হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে অর্থাৎ রাজ্য সরকারকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যা এখনও পর্যন্ত করা হয় নাই বলেই খরব।

মেঘালয় এবং অসম— দুটি প্রদেশেরই বাংলাদেশ সীমাবর্তী গ্রামগুলোতে সংঘর্ষ ছড়াতে রাজনীতিকদের ভূমিকাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অসমে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। এরকম সময়ে রাভা জনজাতিদের উপর আক্রমণে উস্কানি দেওয়া, বাস্তুচ্যুত করে ত্রাণশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া— তারপর ত্রাণকর্তা রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করে তাদের ভোটটা সুনিশ্চিত করা। এই সম্ভাবনার কথা নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। এছাড়া অসমের রাভাদের 'তপশীলি' গণ্য করার দাবী, ষষ্ঠ তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী, রাভা বাদে গারো, অভিবাসী মুসলিম এবং অন্যদেরও একই দাবিতে এলাকায় অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। বনধ্ এবং প্রতিবাদ সংগঠিত করা হচ্ছে।

অল রাভা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (এ আর এস ইউ) নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করেছে ঃ "অবৈধ অভিবাসীরা মেঘালয় ও অসম জুড়ে গারো-রাভা সংঘর্ষে ইন্ধন যুগিয়েছে। উদ্দেশ্য হলো উক্ত জনজাতিদেরকে তাদের লাভজনক রাবার বাগানের ব্যবসায় ও উর্বর কৃষিজমি থেকে উৎখাৎ করে তা দখল করে নেওয়া। রাবার বাগান ও ব্যবসার অগ্রগতি কিন্তু রাভা-গারোরাই করেছে। অবৈধ অভিবাসীরা হলো তৃতীয় পক্ষ, আর তাদেরকেই রাজ্য সরকার, প্রশাসন সংরক্ষণ দিচ্ছে।" এ আর এস ইউ নেতাদের আরও অভিযোগ— স্থানীয় প্রশাসন ওই সব অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতেই চায় না। তার উপর ওদেরকে প্রশ্রয় দেয় শাসক কংগ্রেস দলের স্থানীয় নেতারা।

"এ আর এস ইউ এবং সিক্সথ্ সিডিউল্ড ডিমাণ্ড কমিটির সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে, দুটি রাজ্যেই শাসকদল গারো-রাভা সংঘর্ষে ইন্ধন যুগিয়েছে। তারা অন্ধের মতো চোখ বুজে রয়েছে— যেখানে উগ্রপন্থী 'অচিক ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়ার কাউন্সিল'-এর আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিরা পূর্ব গারো পার্বত্য জেলায় রাভা-গ্রাম আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিল।" গারো-রাভা পীস কমিটি-তো এসকল কথা অভিযোগের সুরে আগেই জানিয়েছে।

কয়েকদিনের গোষ্ঠী সংঘর্ষের সময়ে দুটি রাজ্যেই প্রশাসনের দেখা মেলেনি। সম্পূর্ণ ব্যর্থতা দেখা গেছে ওই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায়। এমনকী দাঙ্গা এবং দাঙ্গাকারীদের বিষয়ে কোনও পূর্বানুমানও প্রশাসন করে উঠতে পারেনি। দ্রুত ত্রাণ-ব্যবস্থা নিতেও ব্যর্থ। আর কথা উঠেছে স্থানীয়-জেলা প্রশাসন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত— যে কোনও কারণেই দাঙ্গাকারীদের ভয়ঙ্কর ঘটনা আটকাতে পারেনি। দাঙ্গার পরিকল্পনাকারীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতেও ব্যর্থ হয়েছে।

ঝগড়া-ঝামেলার অনেক কারণ থাকলেও অভিযোগ— চার্চ, উগ্রপন্থী সংগঠন, বাংলাদেশী মুসলমান (অবৈধ অভিবাসী), ব্যতীত কতিপয় এন জি ও-র সন্দেহাস্পদ ভূমিকার একত্রীকরণের ফলেই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে গেল। গারো-রাভা পীস কমিটি এরকম কথাই প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছে। এখন প্রয়োজন জাতীয় তদন্ত সংস্থা ছত্তগড়-কে দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করানো, দুটি রাজেই শান্তি সুস্থিতি সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনতে ব্যবস্থা নেওয়া এবং বাস্তুচ্যুত পরিবার সমূহকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

লেখক ঃ অসম সরকারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব। সৌজন্যে ঃ 'দি সেন্টিনেল'

নাগপুরে প্রথম ভারতীয় আন্তর্জাতিক শক্তি সম্মেলন

সূর্যই শক্তির উৎস

দেবীপ্রসাদ রায়

২০১১ সালের ২৭ জানুয়ারি নাগপুরে এসে মিলিত হলো দেশের চারটি প্রান্ত— কলকাতা, অমৃতসর, রাজকোট এবং কন্যাকুমারী থেকে আগত চারটি শক্তি সচেতনতা যাত্রা। ২৮-৩০ জানুয়ারি প্রথম ভারতীয় আন্তর্জাতিক শক্তি সম্মেলন হয়ে গেল নাগপুরে যা কিনা ভারতের ভৌগোলিক কেন্দ্র। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ভারতের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান-আন্দোলনের সংগঠক 'বিজ্ঞান ভারতী'। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা'র রবীন্দ্রসদন থেকে যে যাত্রা গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৯ তম জন্মদিনে উলুবেড়িয়া-খড়্গপুর-বাঁকুড়া হয়ে ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করে তার সংগঠক ছিল বিজ্ঞান ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখা— বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন। সহায়ক ছিল কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রীণ এনার্জি ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং সর্বোপরি ভারত সরকারের পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি-মন্ত্রক।

১২ জানুয়ারি এই যাত্রার শুরু বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান সচেতনতা ও শিক্ষা প্রসারে অপরিসীম আগ্রহ ও আবেদনের প্রেক্ষিতে। বিদেশে থাকাকালীন সেখানকার জনজীবনচর্যার মান উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কার্যকারিতা স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। ভারতের দারিদ্র্য ও দুঃখমোচনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। দেশের যুবকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন গ্লোব, দূরবীন ইত্যাদি ছোটখাটো যন্ত্রাদি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে বিজ্ঞান সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মতোই ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটেছে ও ঘটছে। তারই অঙ্গ হিসেবে শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহারের জন্য, তার যোগানের জন্যই শক্তি-সচেতনতা আন্দোলন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি চাহিদার জন্য শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি সমূহের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা— জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু বিপুল থেকে বিপুলতর চাহিদার প্রেক্ষিতে তা প্রতিনিয়তই অপ্রতুল হয়ে পড়ছে।

দ্রুত চাহিদা মেটানোর জন্য নানাধরনের ঝুঁকি নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের মধ্যেই বিদেশের সঙ্গে পরমাণু-চুক্তিতে যেতে হয়েছে। কিন্তু তার ভবিষ্যৎও ষোলো আনা নিরাপদ, নিশ্চিন্ত বা নিশ্চিতভাবে জনস্বার্থ-অনুকূল নয়। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সমূহের রূপায়ণ যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে তা আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে ইতিমধ্যেই কণ্টকিত করেছে, তাপবিদ্যুৎ পরিমণ্ডলীয় দূষণকে বিপজ্জনক স্তরে নিয়ে গেছে, খনিজ সম্পদের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করেছে। পরমাণু সংযোজন পদ্ধতিতে দূষণ মুক্ত বিপুল শক্তি পাওয়া সম্ভব। একটি পরমাণু বিভাজনে যেখানে ০.৮৪ এম ই ভি ছত্রভঙ্গ শক্তি পাওয়া যায় সেখানে হাইড্রোজেনের দুটি আইসোটোপ D_2 এবং D_3-র সংযোজনে নির্গত হয় ৫.৬৯ এম ই ভি পরিমাণ শক্তি। অর্থাৎ এক গ্রাম জ্বালানী পরমাণু ইউরেনিয়াম ধ২৩৫ বিভাজনে সৃষ্ট শক্তি যা দিয়ে ৩০,০০০ কে. জি. কয়লা পুড়িয়ে এক মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ২২৯ ঘণ্টা চালানো যায়। সংযোজনে অংশগ্রহণকারী এক গ্রাম ডয়ট্রিয়াম (D_2) -টাইট্রিয়াম (D_3) ছয়গুণ বেশি শক্তি দিতে সক্ষম। কিন্তু প্রযুক্তিগত বাধা বিশাল— আর্থিক ব্যয়ভারও বিশাল। নিয়ন্ত্রণযোগ্য উপযুক্ত সংযোজন-চুল্লী তৈরি করা বাণিজ্যিক ভাবে এখনো সম্ভব হয়নি বললেই চলে। গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই তা আটকে আছে। আমাদের দেশেও 'আদিত্য' নামে টোকোম্যাক পদ্ধতিতে (রাশিয়ান) চুল্লীর পরীক্ষা প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করতে পারেনি।

প্রযুক্তিগত বাধা অতিক্রম করতে পারলে অসীম শক্তি-ভাণ্ডার খুলে যাবে আমাদেরই সামনে। কিন্তু আপাতত সে পথ রুদ্ধই। ১৯৮৯ সালে একটু আলোর ঝিলিক দেখালেন সাদাম্পটর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ মার্টিন ফ্লেসম্যান এবং উটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন প্রযুক্তিবিদ স্টানলি পন্স। পরমাণু সংযোজনের জন্য যে প্রারম্ভিক অত্যুচ্চ তাপমাত্রার (প্রায় এক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) প্রয়োজন এবং যা সংযোজন চুল্লী তৈরির পক্ষে এক বিরাট বাধা সেই তাপমাত্রাকে এড়িয়ে এক বিকল্প পথের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবী করলেন তাঁরা। পরীক্ষাটি আসলে একটি সাধারণ তড়িৎ-বিশ্লেষণ পরীক্ষা, শুধু এখানে সাধারণ জলের পরিবর্তে তাঁরা নিলেন ভারী জল (DO_2) এবং নিলেন তড়িৎদ্বার হিসেবে একদিকে প্লাটিনাম এবং আর এক দিকে প্যালাডিয়াম। ক্যাথড প্যালাডিয়াম থেকে নির্গত হলো ডড়্' এবং সেই সঙ্গে ক্যাথডটি মাত্রাতিরিক্ত ভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। ভাবা হলো ডড়্ সংযোজনের ফলেই এই উদ্ভূত তাপ। কারণ ক্যাথডকে যথেষ্টভাবে আড়াল করা হয়েছিল যাতে মহাজাগতিক রশ্মি কারও সাথে সংঘটিত হতে না পারে। অত্যুচ্চ তাপমাত্রার সংযোজন পরীক্ষা যারা করছেন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে তার এইভাবে 'সংযোজন' হতে পারে, তা মেনে নিলেন না। আন্তর্জাতিক স্তরে বিতর্কের ঝড় উঠল। ভোটভুটিতে বিসর্জিত হলো এই দাবী। কিন্তু প্রস্তাবকরা পিছু হঠতে রাজী হলেন না। শীতল সংযোজন (cold fusion) এর বাস্তব প্রয়োগ দেখানোর চ্যালেঞ্জ নিলেন তাঁরা। কিন্তু শেষ অবধি সে প্রয়াস ব্যর্থ হলো এবং 'শীতল সংযোজনে'র ইতি ঘটলো এক অর্থে। তা হলে শক্তি যোগানের জন্য কী করা যাবে। বর্ষাকালে দেখেছি কোটি কোটি ভোল্টেজ-এর উৎপত্তি। কিন্তু তাকে সঞ্চয় করার কোনও উপায় নেই এখনও অবধি।

একমাত্র উৎস আছে শক্তি যোগানোর —সেটি হলো সূর্য। স্মরণাতীত কাল থেকে শক্তি যুগিয়ে আসছে নানা ভাবে। মাত্র চল্লিশ মিনিটে সূর্য কিরণ মারফৎ যে শক্তি ভূপৃষ্ঠে পড়ছে তা গোটা বিশ্বের এক বছরে ব্যয়িত শক্তির সমান। অনন্ত শক্তির উৎস এই সূর্যকে নিয়ে ভেবেছেন আমাদের প্রাচীন ঋষিরা— বন্দনা করতেন "জবাকুসুম সংকাশম্ কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম, ধ্বন্তবিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।" নানাজনে নানা ভাবে সূর্যকে দেখেছেন তাঁরা, তাই সূর্যের অষ্টোত্তর শতনাম পাওয়া যায় সংস্কৃত রচনাবলীতে। আমাদের ধারণার ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রাণ আছে একমাত্র সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতে। এই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির, ধারণের পরিমণ্ডল সূর্য নিয়ন্ত্রিত। এই পরিমণ্ডলের শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য প্রাণ ও প্রাণীর অস্তিত্বের বিকাশের অনুকূল পরিমণ্ডল বজায় রাখার জন্যই ঋষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছিল গায়ত্রী মন্ত্রের— ভূর্ভুবস্বঃ— এই ব্যহৃতি ত্রয়ের উচ্চারণ শুরু হয়েছিল বৃহদারণ্যক উপনিষদের কালে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সময় থেকে। পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং সূর্যের ওৎপ্রোত সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য। এই সামগ্রিক সচেতনতার অভাবই কীভাবে ধ্বংসের দিকে অস্তিত্ব সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের তা আমরা এখন নিশ্চয়ই অনুভব করছি। দূষণমুক্ত শক্তির জন্য বিজ্ঞানীরা এখন শক্তির উৎস হিসেবে সূর্যকে ব্যবহার করার কথাই ভাবছেন। আতস কাচের সাহায্যে সূর্যের আলোকে ফোকাস বিন্দুতে সংহত করে কাগজ বা কাপড়, খড়কুটোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায় আমরা জানি। এটিকেই ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে ইস্রায়েলী প্রযুক্তির সহায়তায়, এ্যারিজোনাতে। সারিবদ্ধ পরিবলয়কৃতি দর্পণের ফোকাস লাইন বরাবর পাইপের মধ্যে রাখা তরল যেমন ইথিলিন গ্লাইকলকে সূর্যকিরণের সাহায্যে উত্তপ্ত করে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো তাপবিনিময়কারকে (Heat Exchanger) ওখান থেকে অতিতাপমাত্রার বাষ্পকে (steam) নিয়ে যাওয়া হয় টারবাইনে— এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎকে গ্রীডে। কিন্তু এ তো যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকবে ততক্ষণ। মেঘলা দিনে বা রাতে কী হবে? তরল বাহিত তাপকে সঞ্চয় করতে হবে, ভাবা হলো ওই উত্তপ্ত তরলকে যদি গলিত লবণের আকারে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তাপকে গলিত লবণ অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারে। পরে ওই তাপকে নিষ্কাশন করে বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। এইভাবে স্পেনে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে প্রতিদিন সাত ঘণ্টা ধরে তাপ সঞ্চয় করে। আমেরিকায় গবেষণা করে দেখা গেছে প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টার জন্য তাপ সঞ্চয় করতে পারলে ২৪ ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব। সূর্য থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। ফটো ভোল্টেরিক সেল বা সৌরকোষ (Solar Cell) তৈরি করে। স্দ্ন অর্ধপরিবাহীর উপর সূর্যের আলো পড়লে স্দ্ন অর্ধপরিবাহীর যোজনাকাঙ্ক্ষী ইলেকট্রনের পটি (Band) থেকে ইলেকট্রন ৎ অর্ধপরিবাহীর পরিবাহী পটিতে চলে যায়। যোজ্যতা পটিতে সৃষ্ট ছিদ্র (hole) ধনাত্মক আধান যুক্ত ইলেকট্রনের মতো ব্যবহার করে এবং ফলতঃ একটি বিভব বৈষম্য তৈরি হয় এবং তড়িৎপ্রবাহ তৈরি হয় এবং কার্যত একটি সৌর কোষের সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত বহুসংখ্যক সৌরকোষ থেকে ব্যবহার যোগ্য বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়, এই কাজটি আসলে করেছিলেন সর্বপ্রথম জগদীশচন্দ্র বসু। উন্নতমানের কোহেরর তৈরির প্রয়াসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে স্ফটিক গ্যালেনা (Pbs-লেড সালফাইড)-র উপর একটি ধাতুর তারের সূক্ষ্ম সংযোগে তৈরি করলেন এক নতুন কোহেরর— নাম দিয়েছিলেন বৈদ্যুতিক চোখ বা Electric Eye— দৃশ্য আলো তো বটেই অতিবেগুনী রশ্মি (অদৃশ্য) এর উপর পড়লেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং সূর্যের আলো পড়লেও তাই হবে কার্যত এটি একটি ফটো ভোল্টেয়িক সেল বা সোলার সেল [Solar Cell]। উন্নতমানের এইসব বহু সংখ্যক কোষের সজ্জা থেকে ব্যবহারিক কাজের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায় এবং এর বহুবিধ প্রয়োগ আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে আছে। এখানেও সূর্যালোকবিহীন দিনে কী হবে সে প্রশ্ন আছে। এই বিদ্যুৎ প্রবাহকে সর্বক্ষণ ব্যবহার করার জন্য পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। ইস্রায়েলী আদর্শে (Model) ক্যাডমিয়াম সালফাইড ও ক্যাডমিয়াম টেল্কুরাইড অর্ধপরিবাহির দ্বারা প্রস্তুত কোষ সজ্জা থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ প্রবাহকে কীভাবে গ্রিডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে (চিত্র-১) (চিত্র-২)-তে দেখানো হয়েছে। উচ্চচাপে সংকোচিত বাতাস-শক্তির ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারে পাঠানো দিবালোকে সৃষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহকে। ১৯৯১ সাল থেকে এই ব্যবস্থা চলছে ম্যাকিনটোস আলোতে আগত বিদ্যুৎ প্রবাহ মোটর এবং সংকোচক (Compressor) চালিয়ে বাতাসকে সংকোচিত করে ভূগর্ভস্থ বৃহৎ শূন্য গহ্বরে পাঠায়। এই বাতাসকে মুক্ত করার সময় প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে তাপ সৃষ্টি করে সম্প্রসারণশীল বাতাসের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে যে কোনও সময়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। আমেরিকা আশা করছে ২০৫০ সালের মধ্যেই তার সমস্ত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাবে সূর্য। আমাদের দেশেও সূর্য অকৃপণ ভাবে কিরণ দিচ্ছে। এই শক্তি সচেতনতা আন্দোলন সবাইকে ভাবাক কী ভাবে আমরা উপকার মূল্য অনুপাত ঠিক রেখে জনস্বার্থে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করব। মানব কল্যাণচিন্তা-উন্নতমানের নিরন্তর উপাদান বিজ্ঞান গবেষণা (Material Science Research) অচিরেই সাফল্য এনে দেবে বলে আশা করা যায়। আমাদের সুপ্রাচীন সূর্যবন্দনা ও সূর্যসচেতনতা তখনই সার্থক হবে।

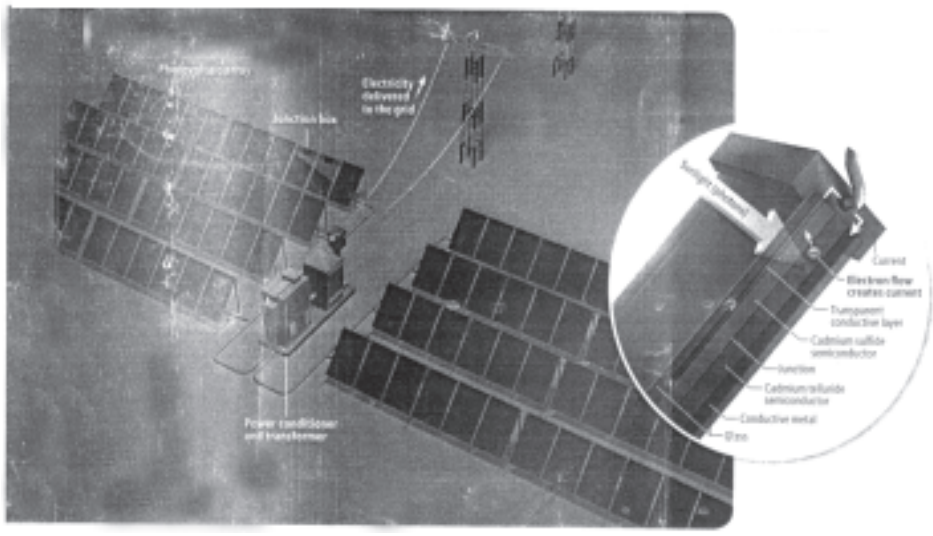

চিত্র-১, ক্যাডমিয়াম সালফাইড ও ক্যাডমিয়াম টেল্কুরাইড দিয়ে তৈরি কোষ-সজ্জা থেকে গ্রীডে বিদ্যুৎপ্রবাহ।

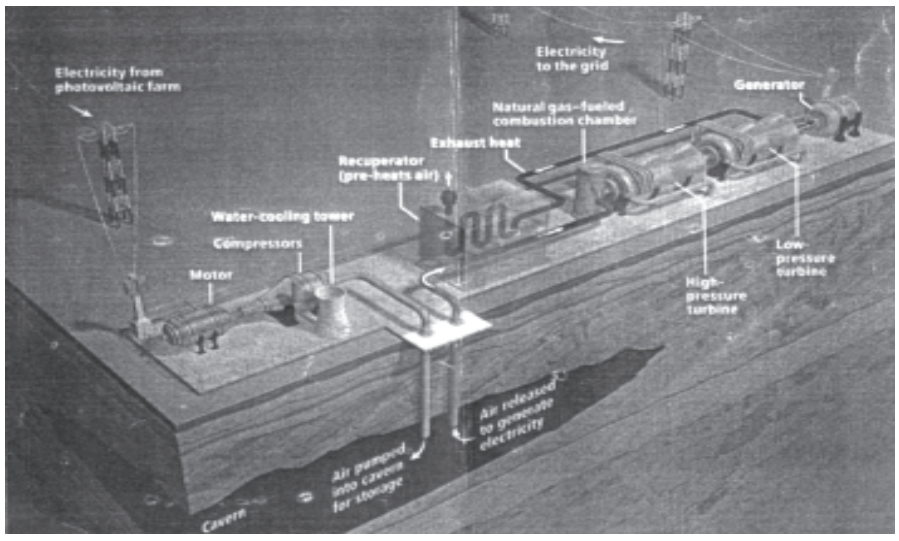

চিত্র ১-এর অনুরূপ।

একাত্তরের চেতনা একটি অনিবার্য উপন্যাসের নিবিড় পাঠ

হুমায়ূন আজাদ

অচিন্ত্য বিশ্বাস

আবু আল আসার হাফিজ জালান্ধরী (১৪.১.১৯০০—২১.১২.১৯৮২)-র লেখা পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত— 'পাক সার জমিন শাদ বাদ' নিয়ে সম্প্রতি সামান্য বিতর্ক জমে উঠেছে। তিলোক চাঁদ মাহরুন নামক এক ব্যক্তি দাবি করেছেন কয়েদ-এ-আজম মুহম্মদ আলি জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) তাঁর রচিত একটি গানকে পাকিস্তান স্বাধীন হবার পাঁচদিন আগে সেদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে মনোনীত করেন। আজকের এই লেখা সেই বিতর্ক নিয়ে নয়। ১৯৫০ থেকে 'পাক সার জমিন শাদ বাদ' পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃত। পাঞ্জাবের জলন্ধরে জন্মেছেন হাফিজ; ১৯৪৭ সালে স্বেচ্ছায় চলে যান লাহোর। সেখানে বসবাস করার সময় লেখেন আর একটি গান;স্বাধীন (?) কাশ্মীরের জন্য। 'ওয়াতন হামারা আজাদ কাশ্মীর' ইত্যাদি। আজকের এই লেখা সপ্তম শ্রেণী উত্তীর্ণ প্রায়-নিরক্ষর ('lack of formal education'-এর অধিকারী) হাফিজের ওই গানটিকে সামনে রেখে লেখা একটি উপন্যাস নিয়ে। লেখক হুমায়ুন আজাদ। তাঁর অন্য একটি উপন্যাস নিয়ে কয়েক সংখ্যা আগে 'স্বস্তিকা'-য় লিখেছি। এই উপন্যাসে হাফিজের গানের প্রথম পংক্তি সামান্য বদলে নিয়েছেন হুমায়ুন। বইয়ের নাম দিয়েছেন ঃ 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'।

'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার ঈদ সংখ্যা ২০০৩-এ প্রকাশিত এই ছোট্ট উপন্যাস সামান্য পরিবর্তিত আকারে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ২০০৩-এর ডিসেম্বরে। আমরা দেখছি দ্বাদশ মুদ্রণ ২০১০। যাঁরা খেদ করেন বাংলা বইয়ের কাটতি নেই— তাঁরা নিশ্চয় অবাক হবেন। 'আগামী' প্রকাশনীর এই বই মাত্র ১১২ পাতার। টাইটেল পেজ বাদ দিয়ে প্রকৃত পক্ষে মাত্র ১০০ পাতা প্রায়। এই বই কে নভেলেট বলা ছাড়া গতি নেই। তাছাড়া নায়কের নাম না থাকা— এক দিক থেকে নায়ক আর খলনায়ককে একই সঙ্গে উপস্থাপন করা (সেদিক থেকে অধুনান্তরিত সাহিত্যে যাকে বলে antihero—তার ছাপ পাওয়া) লেখাটিকে অন্য ধরনের করেছে।

ছোট কিন্তু বারুদে ঠাসা এই বই নিয়ে বাংলাদেশের রক্ষণশীল মুসলমানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। বইটি নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। কারণ, এখানে হাজির আছে বাংলাদেশের এমন অন্তর্বাস্তব যা সহ্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। বইটি নিষিদ্ধ হয়নি, কিন্তু হুমায়ুন আজাদের কণ্ঠ চিরকালের জন্য স্তব্ধ করা গেছে। ছুরিকাহত হুমায়ুন চিকিৎসার জন্য যান জার্মানী। সেখানে কে বা কারা আক্রমণ শানায়। মারা যান হুমায়ুন।

উপন্যাসের বিষয়টি সামান্য— বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার। পাশাপাশি সেদেশের কদর্য রাজনীতি আর ধর্মধবজীদের বর্বরতা। তাদের শত্রু মানবিক মূল্যবোধ, গণতন্ত্র, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু নিরীহ সাধারণ মানুষ। শ্বাসরোধ হয়ে আগে আত্মকথন রীতির এই কাহিনীর কথকের বর্ণনা পড়তে গিয়ে। অত্যাচারের সীমাহীন ঘটনার পর ঘটনা। উত্তম পুরুষটির একটু রাজনৈতিক অতীত আছে। একসময় সে ছিল 'সাম্যবাদ ও সর্বহারা' রাজনীতিতে। পরে বুঝেছে 'তলোয়ার হচ্ছে বেহবাতের চাবি'। বাংলা দেশে গড়ে ওঠা 'জ্যামাঈ জিহাদে ইছলামপার্টি'-র একটি অঞ্চলের দায়িত্ব পাবার পর শুরু হয়েছে তার কীর্তি।

প্রথম কীর্তি 'শক্তির ঠাণ্ডা আগুন জ্বালানো, যা জ্বলে না, দহন করে।' (২১ পৃ.)। বাংলাদেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রচার ও ঢাক ঢোল পেটানোর বিরাম নেই। অথচ তার আড়ালের বাস্তব পরিস্থিতিটি এই 'শক্তির ঠাণ্ডা আগুন'-এর প্রসঙ্গে স্পষ্ট বোঝা যায়। হিন্দুদের সম্পর্কে তার গোপনে যেসব শব্দ ব্যবহার করে তা সমবেত ইসলামোচিত সংস্কৃতিই, কিন্তু তার সঙ্গে গণতন্ত্রের মিল নেই। 'মালাউন' (অর্থাৎ অভিশপ্ত শয়তান), নাছারা, কাফের, মোনাফেক (ধ্বংমুনাফেক, কপট, মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী) প্রভৃতি জুৎসই বিশেষণের অভাব নেই। একটি চরিত্রের মুখে শোনাচ্ছেন হুমায়ুন ঃ ...'ইছলাম ছাড়া আর সলিশন নাই; ...ডমোক্রেছিরেও কবর দিমু,...ইছলামের দিকে আমরা দশ কদম আগাই যাইব, পাকস্থানের দিকে বিশ কদম আগাইব, আমরা আবর পাক সার জমিন সাদ বাদ গাইতে পারুম।' (১৪ পৃ.)। অর্থাৎ ১৯৭১-এর বাঙালী-জাতিসত্তা, ১৯৫২-র ভাষা চেতনা সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে বাংলাদেশকে পাক (পবিত্র) স্থানে পরিণত করার লক্ষ্য তাদের। তারই কর্মসূচী 'শান্তির ঠাণ্ডা আগুন' জ্বালানো।

হিন্দু পাড়ায় গিয়ে জামাঈ জিহাদে-রা বলে 'ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই।' (২২ পৃ.)। 'মালাউন'-দের বিশ্বাস করে না তারা। ভোটের আগের দিন তাদের এই 'শান্তির ঠাণ্ডা আগুন' জ্বলে সারা দেশে— 'সীতারামপুর, হরিরামপুর, মদনগঞ্জ, মদনপুর, ব্রাহ্মণভিটা, কালীগঞ্জ'— এইসব তাদের গ্রাম। নায়ক ভাবে এসব নাম 'মালাউনপল্লী'-র হিন্দু সংস্কৃতির চিহ্ন— 'নামগুলোকেও বদলে দিতে হবে' (২১ পৃ.)। জামা কাপড়ের আড়ালে তাদের 'নানা রকমের শান্তিপ্রদ জিনিশ' যথা— 'দু-একটা পিস্তল, দু-একটা কাটা রাইফেল দু-চারটি ক্ষুর, কয়েকটি এম-১৬'— উঁকি দিচ্ছিল! এসব তো ছিলই, গোপাল চন্দ্রের বাড়িতে উদাহরণ-স্বরূপ আগুন জ্বালায় তারা। ...'এই সন্ধ্যায় গোপাল চন্দ্রের' বাড়ি যখন জ্বলে তখন কয়েকজন শান্তির পবিত্র ধর্মের জেহাদী, ও সি-র সঙ্গে 'একটু ব্ল্যাক লেবেল একটু দিভাস রিগ্যাল' পান করতে থাকে। (২৩ পৃ.)। এইভাবে 'দেশ জুড়ে শান্তির ঝড়' বয়ে যায়। ইচ্ছা ওদের ঃ 'যাতে ওরা দেশে না থাকে, আর থাকলেও যেন না থাকে।' (২৬ পৃ.)। বস্তুত বাংলাদেশের এই বাস্তবটি আমরা সাধারণভাবে জানি না— জানতে দেওয়া হয় না। কেমন করে সে দেশের সংখ্যালঘু জনসাধারণ non-entity (থেকেও নেই) হয়ে যাচ্ছে তার গা ছম ছমে বিবরণ এই উপন্যাসের মর্ম। অন্যত্র নায়ক ভেবেছে 'তাদের আমরা চিরকালের জন্যে নাম পরিচয়হীন করে দেবো।' (৬৭ পৃ.)। উপন্যাসটি এই বাস্তবের ঘনীভূত রূপ।

উক্ত জামাঈ জেহাদী-র দ্বিতীয় কীর্তি হলো সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করা। ব্যাপারটি বাংলাদেশে যেভাবে ঘটছে তার কোনও তুলনা পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা জানি না। আমাদের রাজ্যেও কখনও কখনও এমন হয়নি তা বলা যাবে না। হ্যারিসন রোড-কে মহাত্মা গান্ধী রোড, এসপ্ল্যানেড ইস্টকে সিধু কানু ডহর আর অতি সম্প্রতিকালে পাতাল রেল স্টেশনের নাম বদলের সঙ্গে আমরা পরিচিত। বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা কল্পনাতীত। ঢাকার পাশে জাহাঙ্গীর নগর, মৈমনসিংহের স্থলে জমিনশাহী এরই ফল। ভৈরব আর শ্যামসিদ্ধ— এই দুটি নাম বদলের চেষ্টা, ভৈরবকে 'ওমরপুর' আর শ্যাম সিদ্ধিকে 'আশিগঞ্জ' বানাতে চায় তারা। এভাবে ওরা 'পৌত্তলিক' 'মালাউন'—নাম ধ্বংস করতে চায়। 'খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, মুহম্মদ বিন কাশিম, ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার, তারিক, ওসামা লাদেন'-দের মতো আদর্শ সভ্যতাধ্বংসী অত্যাচারী হবার ইচ্ছা তাদের।

ভৈরব নাম বদল হলো সহজে। বিনা বাধায়। কোনও প্রতিবাদ আসেনি— প্রতিরোধ। সংখ্যালঘু আর সংখ্যালঘুদের বন্ধু (উপন্যাসের নায়কের ভাষায় 'মুরতাদ';আরবী শব্দটির অর্থ ধর্মত্যাগী;পশ্য— কোরান-এর সুরা নাহ্‌ল ১৬ : ১০৬)— কেউ জনপদটিতে থাকেনি। বিশেষত সংখ্যালঘুদের সুন্দরী যুবতীরা। তারা না থাকায় জিহাদীদের কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ দেখিয়েছেন উপন্যাসিক। একটি ঘটনাই ঘটে— উল্লেখযোগ্য সেই ঘটনা, ধ্বংস যজ্ঞের উন্মাদনার মধ্যে অঞ্চলের দুই নম্বর জিহাদী মোঃ হাফিজুদ্দিনের মাথার ঘিলু উড়ে যায়। নায়কের ভাবনায় এসেছে সেই নিষ্ঠুর রাজনৈতিক অভিসন্ধি। 'তুমি একটু বেশি এগিয়ে যেতে চেয়েছিলে' (৭২ পৃ.); তার শহীদ হবার ঘটনায় খুশি জামাঈ জেহাদি-দের বড় নেতাও। তার কথা : 'আমাগে একজন মহান শহিদ দরকার আছিল।' (৭০ পৃ.)। ফলে পাঠক বুঝতে পারেন 'পাক পবিত্র স্থান' আসলে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র— আর সেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শেষ লক্ষ্য বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'মাই গোল্ডেন বেঙ্গল'-কে সরিয়ে যে গান 'রিটেন বাই এ পারফেক্ট মুছলমান' —'পাক সার জমিন সাদ বাদ'। (৮৭ পৃ.)। ফোনের পর ফোন আসে— অভিনন্দন পেতে থাকে নায়ক।

রাজনীতির বহু কদর্য উপাদানে এই ছোট্ট উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলি উপচে উঠেছে। মৌলবাদী জেহাদীদের চোখে খিলজি (অর্থাৎ বি. এন. পি-র বকলম দল) আর শেখ (সম্ভবত আওয়ামী লীগের পরিবর্ত নাম)— এই দুই মূল ধারার রাজনীতির মধ্যে মৌলবাদীরা ঢুকে ভেতরে ভেতরে সেই গণতান্ত্রিক ধারাকে ধ্বংস করতে চায়। 'এক মাইয়ালোক যায়, আবর আরেকটা মাইয়া লোক আসে'— এ কখনই ইসলাম সম্মত নয়। তবু কৌশল ('ট্যাক্ট) হিসাবে একে মেনে নিতেই হচ্ছে! আসলে তারা তো চায় 'মহান তালেবান'-দের মতো মেয়েদের পুরুষদের অধীনে রাখতে। তারা বিশ্বাস করে 'মাইয়ালোক হইল শয়তান, কিৎনা, গোলমাল'— তাদের জন্যই পুরুষরা স্বর্গচ্যুত! (১৪ পৃ.)। তাদের ইচ্ছা 'ইনভার্ছিটি' ধ্বংস করা— মেডিকেল কলেজ ধ্বংস করা! তারা চায় সার্বিক শরিয়তি শাসন।

তীব্র কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ— হুমায়ুনের অস্ত্র। ভাষার এই ব্যবহার উপন্যাসটিকে শিল্পশোভন করেছে। 'অদ্বিতীয় সানগ্লাস জেনারেল' (বলা বাহুল্য জিয়াউর রহমান)-এর বাচন ভঙ্গিতে অধ্যক্ষ 'ছিল না' অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানে বিসমিল্লার নাম;সেই সানগ্লাসকে 'দূরদৃষ্টির সানগ্লাস' বলা আর জিহাদীদের আদর্শ হিসাবে 'পাকস্তান প্রতিষ্ঠা'র চেষ্টায় সাফল্যের ইশারা ভাষিক নির্মাণ হিসাবে চমৎকার (১৯ পৃ.)— বাংলাদেশের রাজনীতির পশ্চাদ্‌যাত্রার ইঙ্গিতে শিহরিত হয়।

বেশ কিছু প্রতীকের বিন্যাস পাচ্ছি উপন্যাসটিতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় একটি সেতু ভেঙে ফেলে খান সেনারা। পরে সেই সেতু গড়ে তোলা হয় ভারতের সহযোগিতায়। বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের সাধারণ মানুষ আর সৈনিকরা যে সহায়তা করেছিল তার তুলনা বিশ্ব ইতিহাসে নেই। আর সেই সহায়তাকে বেমালুম অস্বীকার করার মতো কৃতঘ্নতার উদাহরণও সম্ভবত কোথাও মিলবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা আজও একই মাতৃভাষার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি! হুমায়ুন আজাদ বা শাহরিয়ার কবির, আহমদ শরীফ ও তসলিমা নাসরিনের মতো ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন। তারা আমাদের প্রাণিত করেন। আর আছেন তরুণ তরুণীরা —যারা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে বাঙালীর উত্তরাধিকার হিসাবে অহঙ্কার করছেন না বলেই জানি। হুমায়ুন আজাদের চরিত্র মোঃ হাফিজুদ্দিন বলেছেঃ 'পাকিস্তান ভাঙ্গনের জইন্যে যেমন এই বিরিজ ভাঙছিল, আবর পাকিস্তান বানানের জইন্য এই বিরিজ ভাঙতে হইব।' (৩৮ পৃ.)। এই সেতু— দুই সম্প্রদায়ের, দুই মনোভঙ্গির, দুই যুগের। এই সেতু বানানোর ইচ্ছা শক্তি জড়িয়ে গেছে উপন্যাসটির মধ্যে। এই মহত্তম বার্তাই উপন্যাসটির প্রকৃত প্রাসঙ্গিকতা।

প্রতীক আরও আছে। ৯/১১-উত্তর পৃথিবীতে যখন সন্ত্রাসের সমর্থক হয়ে গেছে ইসলাম, যা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়— পৃথিবীর কোনও গোষ্ঠীর মানুষই এরকম নির্মম, অমানবিক, অত্যাচারী, ধ্বংসোৎক্ষিপ্ত উন্মাদ হতে পারে না। হুমায়ুন আজাদ দেখিয়েছেন তাদের, যারা এমন কি বিজ্ঞানকেও ব্যবহার করতে চায় ধ্বংসের কাজে— তাকেই ভাবে ধর্ম! শ্যামসিদ্ধির মঠ-টি ধ্বংস করতে চায় তারা। 'বিস্ফোরকবিদেরা ট্রেনিং পেয়েছে দেশে ও

(এরপর ৯ পাতায়)

বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী মিথ ভেঙে গেছে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি কাগজপত্র, টিভি চ্যানেল, হাট-বাজার— সব আলোচনাতেই একটা বুদ্ধজীবী, পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবী ইত্যাকার নানান ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যার চাপান-উতোর চলেছে। টিভির আলোচনায় কোনও এক উকিল ভাষ্যকার বেশ রেগেই এক গাদা উকিল-রাজনীতিবিদদের ফিরিস্তি দিয়ে তাঁদের পক্ষান্তরে বুদ্ধিজীবীর দলে ফেললেন। এখন প্রশ্ন হলো, এমন বিতর্কের পরিবেশ হলোই বা কেন? একটু ভাবলে দেখা যাবে ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার (যাদের এই বুদ্ধিজীবী জটলায়) এখনও তেমন ভাবে দেখা যায়নি, তারা কি সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে নেই? নিশ্চয় আছেন। তবে তাঁদের অবদানের দ্বারা মানুষ উপকৃত হলেও সরাসরি তাঁরা মানুষের চিন্তা ভাবনাকে তাৎক্ষণিক প্রভাবিত করতে পারেন না। তুলনায় লেখক, গায়ক, নাট্যকার, চিত্রকর তাদের সামাজিক পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতার সুবাদে সকল সময়েই সমাজে কম বেশি সমাদৃত কেননা সেগুলি এক অর্থে সৃষ্টিশীল। ব্যাপারটা ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত প্রাচীনও বটে, কেননা তা বুদ্ধির থেকে মানুষের হৃদয়ের বা বোধের অনেক কাছাকাছি। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বরাবরই এইসব চর্চাকারদের দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হন। মানুষ ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার উকিল রাজনীতিবিদ হওয়ার অনেক আগেই গুহাচিত্র, তালপাতার পুঁথি বা ঢোলবাঁশি তৈরী করে তার চিন্তা ভাবনাকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াস করেছিল। সেই ভাবনার ক্রমপ্রসারণেই আজকের বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণীয় হয়েছেন। এ বাবদ টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের প্রসারের ফলে শহর তো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও এঁদের একটা তুলনামূলক স্বচ্ছ ভাবমূর্তি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে এর সঙ্গে বিদ্বজ্জন ও বুদ্ধিজীবী গুলিয়ে দিলে হবে না। এমন অনেক বরণীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার আছেন পুঁথিগত বিদ্যায় তাদের স্বীকৃতি হয়ত বলবার মতো নয়। যেমন তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবন ঠাকুর, যামিনী রায়, লালন ফকিরসহ এমন বহু নাম মনে আসবে। এদের সমস্ত কাজই মানুষের কথা ভেবে। বুদ্ধিজীবী হব ভেবে নয়। অথচ এঁরাই ছিলেন তাঁদের সময়ের সেরা গ্রহণযোগ্য বুদ্ধিজীবী।

আন্তর্জাতিক পটভূমি

মার্কামারা বুদ্ধিজীবী প্রজাতির বাড়বাড়ন্তের শুরু সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের পরে। যেখানে সরকারী দলতন্ত্রের লাইনটিতে সর্বদা মান্যতা দেওয়া, মহান করে তোলার তাগিদে এঁদের বাজারে নামানো হয়, নানান সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা-ধন্য এই বুদ্ধিজীবীরা সর্বদাই সরকারী সুরে কথা বলতেন, অথচ পরিস্থিতি ও দল নিরপেক্ষভাবে অবস্থার প্রয়োজনে মানুষের স্বার্থে কথা বলাই বুদ্ধিজীবীর আবশ্যিক চরিত্র ধর্ম। এই অবস্থা রাশিয়ান ব্লকে থাকা ড্রব্তজন্তু, ত্নপসপ্তস্ত, ত্মপসপ্লন্ত্র সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অত্যাচারী রাষ্ট্রের

প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীরা।c

ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে তাঁরা মুখ খুলতে পারেননি, কেননা সেক্ষেত্রে শাস্তির খাঁড়া নেবে আসবে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল গোপন ঘাতকের হাতে মৃত্যু। ইতিহাস ঘাঁটলেই এর প্রমাণ মিলবে। বরিস পেস্তেরনাক সোলাঝনেৎসিন দেশীয় নমুনা-এর মত সাহিত্যিকের রাশিয়া থেকে বিতাড়ন ও দুরবস্থার কথা অনেকেরই জানা।

আমাদের দেশে এই জো-হুজুর বুদ্ধিজীবীর উৎপাদন শুরু মূলত ৬০-এর দশকের পর থেকে। যাঁরা চীন ও রাশিয়ার কাছ থেকে জন্মঋণ শোধ করার তাগিদে আমৃত্যু ভারত বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাম্যবাদী মতাদর্শকে ছলে বলে কৌশলে লাগু করার কাজে নিয়োযিত ছিলেন। ৭০ দশকে নির্বাচনী ধাক্কা খাওয়ার পর থেকে তাঁর শাসনকে চিরস্থায়ী করতে ইন্দিরা গান্ধী এঁদের তোল্লাই দিতে শুরু করেন (অরুণ শৌরী দ্রষ্টব্য)। এ কথা নতুন নয় যে যত রকমের সরকারী, আধা-সরকারী করপোরেশন বা ফাউন্ডেশন আছে শ্রীমতী গান্ধী এঁদের সেখানে গুঁজে দেন। এই ভাবে ল্যাজ মোটা হতে থাকে। যোগ্যতা না থাকলেও ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে এঁরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আমাদের বাংলাতেই তো এনাদের বিশেষ রমরমা, তাই বাল্যবয়স থেকেই এঁদের দেখার সুযোগ হয়েছে। এনাদের সনাক্তকরণ চিহ্ন ও চরিত্র লক্ষণগুলি দু' একজন (সত্যিসত্যি চিন্তাবিদ) বাদ দিলে মোটামুটি একই ছাঁচের। এলোমেলো চুল-দাঁড়ি, বড় পাঞ্জাবী, ঝোলা, আজকাল জিনস গেঞ্জী হয়েছে। ঝোলায় আগে ইস্তাহারটা থাকত, এখন বোধ হয় বেআইনী জমির দলিল-টলিল থাকে। কথা শুরু করলেই সব কিছু গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। আমেরিকাকে গালাগাল, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিষ ঢালা, গরীবের জন্য দুঃখে গলে যাওয়া। মুসলমানের কিছু অযৌক্তিক আবদারে সায় দেওয়া, আর অবশ্যই রাশিয়া চীনকে মহান বানানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি তাচ্ছিল্য।

জাতীয় ক্ষতি

আগে বলা কিছুটা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত হওয়ায় বঙ্গসমাজের সর্ব ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একেবারে নিচু থেকে সর্বোচ্চ স্তর অবধি ধামাধরা অযোগ্য দলদাস ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে মুড়ি মুড়কির মতো পি এইচ ডি বেরোতে থাকে। এরাই আবার পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠানে দৌরাত্ম্য করার সুযোগ পেয়ে বুদ্ধিজীবী বনে যান। এঁদের শুধু একজনের কথা বললেই কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। অখ্যাত সাঁওতাল পরগণার 'অলচিকি' ভাষায় পি এইচ ডি

(এরপর ১৪ পাতায়)

একটা অনিবার্য উপন্যাসের নিবিড় পাঠ

(৮ পাতার পর)

বিদেশে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে আর পাক পাকিস্তানে; তারা জিহাদের বিজ্ঞানী।' (৮৩ পৃ.)। তাদের ধারণা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে ইসলামী জ্ঞান চুরি করেই। তাদের বিজ্ঞান-শিক্ষাকে বিকৃত ধনবাদের চেয়ে বিকৃত মনে হয়। তারা যখন আস্ফালন করে ঃ 'যা বসাইছি তা দিয়া পাঁচ দশটা টুইন টাওয়ার হালাই দেওন যায়।' (৯৪ পৃ.)। ধবংস হয় শ্যামসিদ্ধির মঠ।

বালক নায়ক এক সময় এই মঠের দিকে তাকিয়ে পেত 'উচ্চতার' আকাঙক্ষার আশ্চর্যকে। তার মনে হোত সে ঘাসফুলের মতো নিচু আর ওই মঠ পৃথিবীর যা কিছু মহৎ তার আশ্রয়। এখন সে ইসলামে নিষ্ঠ— আজ জানে 'ধবংস না করে বৃহৎ মহৎ হওয়া যায় না।' (৯৫ পৃ.)। বিশ্বাস করে মঠ তো ছবি তৈরি করে, ছবি— প্রতীক। আর তার ভাবনা ঃ 'আস্তাগফেরুল্লা, ছবি আম দেখতে পারি না, ছবি দেখা কাফেরদের কর্ম।' (৮৬ পৃ.)। 'ছবি না-পাক।' (৮৪ পৃ.)। তার ইতিহাসবোধ অন্য ধারার। সে ভাবে ঃ 'যে জয় করে ইতিহাস তার, ইতিহাস লেখে জয়ীর পরিচারকেরা, খোজা ভৃত্যরা; আমার খোজা ভৃত্যরাও নতুন ইতিহাস লিখবে।' (৮৬ পৃ.)। শেষ পর্যন্ত শ্যামসিদ্ধি আলিনগর হয়— মঠটাও চুরমার হয়ে যায়। ওখানে মসজিদ ওঠানোর জন্য মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাঙ্ক মারফৎ কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। ও হ্যাঁ, আস্তাগফেরুল্লা বলতে বোঝায় 'আমি আল্লার কাছে ক্ষমা চাইছি।' ছবি দেখার পাপ থেকে ক্ষমা চাইতে থাকল জেহাদি নায়ক। অথচ এই চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্তেই আসে গভীর এক পরিবর্তন— ভিতরে ভিতরে জামাঈ জেহাদির নেতাটি ভেঙেচুরে যায়। শ্যামসিদ্ধির মঠটিকে বাস্তবে নিশ্চিহ্ন করার পরও সে অনুভব করে ঃ 'একটি বালক আমার বুকের ভেতর দিয়ে বারবার দৌড়ে আসতে থাকে, মঠটির দিকে তাকিয়ে থাকে, মুগ্ধ হয়ে আবার বাড়ি ফিরে যেতে থাকে।' (৯৫ পৃ.)। অমল শৈশব; তাকেই বলা যায় বাংলা-ভাষা সংস্কৃতি জাতি সত্তার বেড়ে ওঠার রহস্য—১৯৫২-র চেতনা, ১৯৭১-এর সংগ্রামের দিগন্তে ছুটে যাওয়া বিশ্বের নবীন এক রাষ্ট্রের মহত্তম ইশারা। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয় ঃ 'মঠটি পুরোপুরি পুড়ে যাওয়ার পর, ছাই হওয়ার পর, আমি মহাশূন্যতা দেখতে পাই, একটি বালক আর কখনও এটি দেখতে এক মাইল দৌড়ে আসবে না। ওই বালকের মৃত্যু হয়েছে।' (৯৫ পৃ.)।

বস্তুত ওই সেতু আর এই শ্যামসিদ্ধির মঠ ধবংস করা অসম্ভব। ওই দূরত্ব অতিক্রমকারী স্বপ্নদর্শন উচ্চতাপ্রিয় বালককেও বাংলাদেশের হৃদয় থেকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। তাই ইসলামের নামে 'মহাউচ্চ শূন্যতা' তাকে আক্রমণ করে— বুঝতে পারে ওই অত্যাচারী জেহাদি নায়ক তার মধ্যে নতুন এক সত্তা জেগে উঠছে। যে কোনও সার্থক উপন্যাসেই চরিত্রের বিকাশ (development) ঘটানো হয়। প্রধান চরিত্র (protagonist)-এর বিকাশ না ঘটলে উপন্যাস সার্থক হয় না। আর তা সম্ভব হয় নারীর স্পর্শে।

এই উপন্যাসে সেই নারী— কনকলতা। অত্যাচারী জেহাদি তার পবিত্র প্রেমের স্পর্শে মানবিক হয়ে উঠল। একদা সাম্যবাদী— সর্বহারা দল করা এই জামাঈ জেহাদি দলের সর্বেশ্বর নারীদের কামনা বাসনা মেটাবার আসবাব পত্রই ভাবতো। ঠিক যেমন ভাবে আলহজ কোরবান আলি ব্যাপারি। মাদ্রাছা-ই-মদিনাতুন্নাবির প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের। চাকরি দেবার নাম করে সুন্দরী তরুণী লাইশাতুল কদরকে বিয়ে করে, বছরের পর বছর সন্তান জন্ম দেয় আর সাচ্চা মুসলমানের মতো 'প্রোডাকশনে বিশ্বাস করে, প্রোডাকশন ছাড়া করিন কারেন্সি আসে না।' (৪৩ পৃ.)। দুরাচার এই ধনকুবের গারমেন্টের ব্যবসায়ী— সেখানকার দরিদ্র দুঃখী মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে তার ক্লান্তি নেই। তার পুত্ররাও একই রকম।

আর্থিক ব্যাপারে কোনওরকম নৈতিকতার ধার ধারে না আলহজ কোরবান আলি ব্যাপারি। 'মাদ্রাসা গড়ার জন্য বিপুল অর্থ পেরেছে কিনা' জানে না উপন্যাসের নায়ক। 'যতো টাকা পেয়েছে ততোটা খরচও করেনি, আমাকে বেশ কিছু দিয়েছে' (৪০ পৃ.)। অনৈতিক ব্যাপারের সব থেকে বড় ঘটনার বর্ণনা আছে 'ট্রেইটার' নামক চরিত্রের সূত্রে। একদা ট্রেইটার ছিল জেহাদির কমরেড। সাম্যবাদী। এখন বি. সি. এস. হয়ে উপজেলার দায়িত্বে। মাদ্রাসা-পরীক্ষা চলছিল। তদন্ত করে দেখেছে ট্রেইটার 'কাগজে কলমে ১৫০ টি মাদ্রাছা'র স্থলে আছে মাত্র পাঁচটি! অন্য কোনোটি 'হিজল গাছের ডালে', 'আম গাছের ডালে', 'মুদি দোকানের চালে' নাম লেখানো— বাস্তবে নেই। অথচ তার বাবদ 'মাসে তিরিশ লক্ষ টাকা, আর ওই টাকাটা আপনারা ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছেন; দেশকে ফাঁকি দিচ্ছেন, আল্লাকে ফাঁকি দিচ্ছেন।' এই রিপোর্ট গেলে তার পরিণতি কী তা বুঝে দল বেঁধে এসেছে তারা—অসৎ শিক্ষকের দল। শেষ পর্যন্ত তারা এই আমলার সঙ্গে রফা করে— পনেরো লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চায়। পাশাপাশি মাদ্রাসায় যারা শিক্ষা নিচ্ছে, তাদের নৈতিক মানদণ্ডটিও পরখ করেছেন হুমায়ুন।

ট্রেইটর পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে দেখেছে ওরা টোকাটুকি করছে— 'সবাই জুতোর ভেতরে কোরান হাদিসের পাতা ঢুকিয়ে নিয়ে এসেছে' (৫৯ পৃ.)। এদেরকে বাঁচাতে চেয়েছে উপজেলার এক গণ্যমান্য 'চমৎকার বাঙলা' বলা মানুষ। জেহাদি বিশ কারণে মহাশূন্যতা দেখতে পায়নি। এক সময় তার মনে হয়েছে দেশের কোনওখানে—'রঙ নেই, সুর নেই'। ছবি আর সঙ্গীতের বিরোধী শরিয়তী বিধান কায়েম হলে এরকমই হবার কথা।

শ্যামসিদ্ধির মঠ ধূলিসাৎ করে জেহাদি সারা পৃথিবীর মুসলমানদের অভিনন্দন পেতে থাকে। কিন্তু অনুভব করে বাস্তবে গুঁড়িয়ে দিলেও মঠের 'উচ্চতা' আর অস্তিত্বের শক্তি কম নয়। 'মাটির নিচ থেকে কোনও মঠ' মাথা তুলবে— এরকম আশঙ্কা তাকে আক্রমণ করে। তার মনে হয় পাকিস্তানপন্থীদের পাঠানো অজস্র সিডি/ক্যাসেট থেকে একটি নিয়ে 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' শোনার সঙ্গে সঙ্গে— যেন সে 'মহাশূন্যতা দেখতে' পাচ্ছে! (১০৩ পৃ.)। দেশ বিভাগ— দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা করে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। তাকে মিথ্যা করে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে (১৯৭৫, ১৫ আগস্ট)— এই মহাশূন্যতা-ই তো তাদের নিয়তি! তাই জেহাদি নায়ক বোধ করে ঃ 'আমি আর জামাঈ জিহাদিরা আগুন লাগাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, লাল সূর্যের পতাকায়, গেয়ে চলছি পাক সার জমিন সাদ বাদ, আর গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, পুকুরে মাছ মরে ভেসে উঠছে, নারীরা মৃত সন্তান প্রসব করছে, আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়ছে, পাখিরা লুটিয়ে পড়ছে; রক্তে ভিজে যাচ্ছে মাটি...সব নর্তকী খোঁড়া হয়ে যাচ্ছে, চিত্রকরের আঙুলে কুষ্ঠরোগ দেখা দিচ্ছে।' (১০৫ পৃ.)।

এই অবস্থায় কনকলতা এসে দাঁড়ায়। শরীর নিয়ে নয়— মাধুর্য নিয়ে। তার বাবা হরিপদ পাল। অজস্র সব খোয়ানো বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের একজন। 'মূর্তিটুর্তি বানায় না, ওতে পয়সা নেই, দুর্গাটুর্গা বানালেই তো রাতে গিয়ে...জিহাদিরা ভেঙে দেয়।' জেহাদি নায়ক জানে— 'আমরা কালী মন্দিরগুলো চুরমার ক'রে দিয়েছি, দেশে কোনও মন্দিরে থাকবে না' (৪৬ পৃ.)। 'লক্ষ্মী বা সরস্বতী বা দুর্গা' প্রতিমার মতো কণকলতা হরিপদর কন্যা। তার সঙ্গে সম্পর্ক হয় জেহাদির। শেষে তাকে নিয়ে আলিগঞ্জ বা শ্যামসিদ্ধি ছেড়ে পালাতে থাকে জেহাদি। পরিস্কার বাংলা ভাষায় কথা বলে কনকলতা— জেহাদি বিস্মিত। কনকলতার উত্তর 'ওই ভাষা বল্‌তেই আমি ভালোবাসি' (১০৯ পৃ.)। পৃথিবীর মধুরতম ভাষা বাংলা। কে তাকে 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' দিয়ে ঢেকে দেবে? জিন্না পারেননি— ছোট ছোট কয়েদ-এ-আজমরাও পারবে না। শেষ পর্যন্ত ব্যাগ ভর্তি মদ, ৫০০ ক্যাসেট পাক জমিন সাদ বাদ, পিস্তল প্রভৃতি নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে নায়ক অনুভব করে 'নরক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে, কণকলতা— আমার চারপাশে সবুজ বাংলাদেশ।' (১১১ পৃ.)। অন্ধকার দূর হয়, দেখা যায় 'সোনার বাঙলা— সমুদ্রের ভেতর থেকে সবুজের মাঝখানে একটি লাল টকটকে সূর্য উঠছে।' (১১২ পৃ.)। মনে হয় একটা শ্বাসরোধকারী দুঃস্বপ্ন শেষ হলো— হুমায়ুন আজাদের এই উপন্যাসের প্রচ্ছদ এঁকেছেন সমর মজুমদার। অন্ধকারের শিকড় নেমে গেছে অতলের দিকে। নিহিত পাতাল ছায়ায় নিবিড় এক ভয়ঙ্কর। হুমায়ুন আজাদ এ বই উৎসর্গ করেছেন '১৯৭১'-কে। রক্ত রঙের সেই বড় করে ছাপা সংখ্যাগুলি কি শূন্যই হয়ে যাবে? যায়? সম্ভব? ফলে মহাশূন্যের মাঝেও ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠে একটি আশ্চর্য মঠ— ডেকে ওঠে পাখি, রচিত হয় ছবি, গান, উপন্যাস, কবিতা ও নৃত্য। আর ওই 'সমুদ্র'— ওকে মনেই হয় সময়ের জল-ছাপ। কাল-সমুদ্র। কালো নয়। শাশ্বত রাত্রির বুক চিরে মুচকুন্দ ফুলের মতো অনন্ত সূর্যোদয়। সবুজের মাঝখানে এক বিন্দু সিন্দুরের মতো। ভাষা জননীর ওই টিপ মুছে দেওয়া অসম্ভব।

পাক সার জমিন সাদ বাদ ঃ হুমায়ুন আজাদ।। প্রকাশক ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।। দ্বাদশ মুদ্রণ চৈত্র ১৪১৬।।

সেবার আড়ালে

গত ১৩ জানুয়ারি খড়্গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত গোপালী অঞ্চলের মীরপুর গ্রামের (সোনামুখী) বনবাসী (সাঁওতাল) অধ্যুষিত গ্রামে হঠাৎ গিয়ে দেখি প্রায় ৫০/৬০ জন বনবাসীকে নিয়ে ২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা দোভাষী নিয়ে চেয়ারে বসে কি যেন বোঝাচ্ছে। আমি সামনে যাই। পরিচয় নিয়ে জানি তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা, 'প্রভু যীশু'র আদেশে নাকি বনবাসীদের উন্নতির জন্য শিক্ষা ও সেবার কাজ করতে এসেছেন। অর্থ ও জিনিসপত্র দিয়ে গ্রামে সেবা করবেন। আমিও আলোচনায় অংশ নিই। ইতিপূর্বে তাঁরা ওখানে একটি বিদ্যালয় বাড়ী নির্মাণ করতে ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন। যদিও সাঁওতালেরা খড়ের ছাউনিতে স্কুল চালাত। সিপিএম বাবুরা ওই অ-সিপিএম গ্রামে স্কুলের সরকারী অনুমতি দেয়নি। কিন্তু ওখানে সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয় বলে একটি সাইনবোর্ড আছে গত ২০০১ সাল থেকে। ওইদিন (১৩.১.১১) আবার ওরা ২০ হাজার টাকা শিক্ষকদের ৫০০ টাকা হারে মাহিনা বাবদ ও ২০ হাজার শিক্ষণদ্রব্য ও ছাত্রদের স্বল্পাহার বাবদ দেয়। এবং প্রভু যীশুর প্রার্থনা করতে (ইংরাজীতে) শুরু করলে— আমি "সর্বে সুখিনঃ সন্তু...উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকি। তখন উপস্থিত সকলে তা বলে আমার সঙ্গে গলা মেলায়। এবং তাঁদেরকে বলে— "আমাদেরকে যদি ধর্মান্তর হতে বলেন তবে অর্থ নেব না।" তখন অস্ট্রেলিয়াবাসীরা বলেন, "না-না-আমরা ধর্মান্তির করতে আসিনি, প্রভুর আদেশে দুঃস্থদের সেবা করতে এসেছি।" এই বলে চলে যায়।

পরে ১৮ জানুয়ারিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হই এবং বিদ্যালয়টি না মঞ্জুরী হওয়ার কারণ জানতে চাই। তখন দেখি ওই মৌজার ৪০৬ দাগের ৬৫ ডেসিমেল জায়গা সাঁওতাল বিদ্যালয়ের নামে ১৯৬২ সাল থেকে রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও মানিক কর্মকার নামে এক ব্যক্তি জাল দলিল দেখিয়ে তার নামে রেকর্ড করেছে ২০০৬ সালে। এবং সে মেদিনীপুর আদালতে মামলা করেছে সাঁওতালেরা তার জায়গায় জোর করে বিদ্যালয় বানিয়েছে, তাই মঞ্জুরী পাচ্ছে না। আমি কথা দিয়েছি আইনি পরামর্শ দেব এবং যতটা পারি মোকদ্দমার খরচের সাহায্য করব।

—লক্ষ্মীকান্ত দাস, গোপালী, মেদিনীপুর।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও গান্ধীজী

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ৮৫ বছর বয়সে রোগশয্যায় খবরের কাগজে পড়েন যে বৃটিনের কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দিল্লী এসেছেন। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তার চিকিৎসকদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে এবং গান্ধীজীর অনুরোধ উপেক্ষা করে ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৬ দিল্লী আসেন। তাঁর দিল্লী আসার খবর পেয়েই গান্ধীজী প্রার্থনা সভা থেকে ফিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, "আপনি সমস্ত চিন্তার দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে বাকী জীবন চিন্তামুক্তভাবে যাপন করুন"। মালব্যজী তখন বলেন, "আমার দিল্লী আসার কারণ স্বাধীনতার বিনিময়ে ভারতবর্ষ যেন বিভক্ত না হয় তা দেখা।" মহাত্মা গান্ধী যখন তাঁকে আশ্বস্ত করেন, যে ভারত-বিভাজন কোনও মতেই মেনে নেওয়া হবে না, তখন তিনি দিল্লী থেকে কাশী ফিরে যান। তখন কে জানত যে দিল্লীবাসীর তাঁর দর্শন লাভের এটাই ছিল শেষ সুযোগ। ১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে যে দৌরাত্ম্য করেছিল এবং নোয়াখালীতে যে হিন্দু নিধন করেছিল তাতে করুণাময় মালব্যজী অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন এবং এই দুঃসহ আঘাত সহ্য করতে না পেরেই তিনি পরলোক গমন করেন।

—অধ্যাপক সত্যপদ পাল (অবঃ), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

বিনায়ক সেন

বেশ কিছুদিন থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে একজন আজীবন কারাবাসের আসামীর মুক্তির ব্যাপারে হৈচৈ চিৎকার চলছে। ভারতরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' প্রাপ্ত অমর্ত্য সেন থেকে মহাশ্বেতা দেবী, জানা অজানা ব্যক্তি সংগঠন এমন কী দিল্লী উচ্চ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচ্চার এবং বিজেপি ও হিন্দু বিরোধী বলে বিখ্যাত তিস্তা জাভেদ শীতলাবাদ—সবারই সুর একই। কে সেই ব্যক্তি, যার জন্য এদের এতো চিন্তা মাথাব্যথা? ইনি হচ্ছেন ডাঃ বিনায়ক সেন, খুনের রাজনীতির জনক প্রয়াত নক্সাল নেতা চারু মজুমদার এবং বর্তমানে জেলবন্দি বহুখুনের আসামী নারায়ণ সান্যালের সহযোগী। যার কাজ পত্নী ইলিনা সেনের সাথে 'রূপান্তর' নামে এন জি ও তৈরি করে নক্সালদের হিংসাত্মক কাজের বিরোধী 'সালয়া-জুড়ুম'-এর বিরুদ্ধে গরীব জনজাতিদের মধ্যে প্রচার করা। রায়পুর কেন্দ্রিয় কারাগারে এক বন্দীর সঙ্গে আড়াই মাসে তেত্রিশবার তার সাক্ষাৎ করার রেকর্ড কারাগারের খাতায় আছে। নারায়ণ সান্যালের কাছ থেকে নির্দেশ সম্বলিত পত্র বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানোর কাজ করতেন এই সেন। কেন্দুপাতার ব্যবসায়ী পীযূষ গুহ যে এইসব চিঠি বিলি করতেন—এই কথা তিনি কবুল করেছেন। নারায়ণ সান্যাল কে ডংগানিয়া এলাকায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে যে বাড়ী থেকে সেই বাড়ী ভাড়া নেওয়ার সময় ডাঃ সেন নারায়ণ সান্যালকে আত্মীয় পরিচয় দিয়েছিল। এমনকী সান্যাল গ্রেপ্তার হবার পর থেকে তার পরিবারের দেখাশোনার যাবতীয় দায়িত্ব ডাঃ সেন করছিলেন। ব্যাপক অস্ত্র পাচারের কাজে হাতেনাতে ধৃত যুবক এবং তার পিতা প্রফুল্ল ঝা ডাঃ সেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে পরিচিত। ১ জুন ২০০৭ বিজাপুর জেলায় নক্সাল-পুলিশ সংঘর্ষে প্রাপ্ত দলিল দস্তাবেজ ডাঃ সেন এর তার পত্নী ইলিনা সেনের নাম পাওয়া যায়। ডাঃ সেন "পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ" (পি ইউ সি এল) সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি। ইনি ডাক্তার হিসাবে শুধু দেশদ্রোহী নক্সাল বা তার সমর্থকদের চিকিৎসা করে থাকেন। কিন্তু নক্সালদের হাতে নিহত হাজার হাজার গরীব আদিবাসীদের অনাথ পুত্রদের কোনওদিন চিকিৎসা করেননি। এই হাজার হাজার অনাথ শিশুরা রায়পুর, দুর্গ, ভিলাই, রাজনন্দগাঁও এলাকায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আশ্রয়ে বড় হচ্ছে। এই সমস্ত অকাট্য প্রমাণের ফলে রায়পুরের জেলা জজ্ বি পি শর্মা ১২০(বি) ধারায় অপর দুই আসামীর সাথে ডাঃ বিনায়ক সেন-কে আজীবন কারাবাসের সাজা দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন, এই রকম ঘৃণ্য অপরাধীর পক্ষে যারা চিৎকার করছে তাদের পরিচয়ের আড়ালে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে কিনা?

—গৌতম কুমার সরকার, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

লাশ চাই লাশ

ভাগাড়ে শকুন পড়েছে—চারদিকে লাশের খোঁজ। জীবিতের কোনও দাম নেই—না শাসকদলের নিকট—না শাসকের দাবিদারের নিকট। একদিকে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের পালা—অন্যদিকে হায়েনার আস্ফালন! যত লাশ—তত মায়াকান্না—তত প্রচার! কী জানি লাশের কলকাতা সফরই পরিবর্তন কী-না! লাশের রাজনীতি করে রাজ্যবাসীর কোন্ পরিবর্তন আসবে কে জানে! যে হেন প্রকারে মহাকরণ দখলের জন্য বেগম সাহেবা তার চাটুকারবৃন্দ সমারোহে যে 'পালা' আরম্ভ করেছেন তাতে ক্ষমতালিপ্সুদের ভাগ্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী! অন্যদিকে '২৩৫'-এর বেলুন চুপসে যেতে শুরু করতেই প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। আবার গান্ধী পরিবারের পদলেহী পুরুতঠাকুর চোর-ডাকাত-গুন্ডা-বদমাসের 'রাজা'দের 'ওয়েল্থ' বাঁচাতে কূটজাল বিস্তারে নিমগ্ন হন। ওদিকে বাংলাদরদী (!) করাত-করাতী ইমামদের ভাতা বাড়াতে—পাড়ায় পাড়ায় মাদ্রাসা নামের জঙ্গি শিবির বানাতে ওকালতি করেন! 'অধিকারী' মহাশয়ের ভাব-ভাষা দেখে-শুনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় দাদাগিরিতে ওনার ন্যায্য অধিকার। ক্ষমতা পেলে তিনি যে 'দুরমুশ যজ্ঞ' আরম্ভ করবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রাজ্যের দিকে দিকে 'লাশ-যজ্ঞ' বন্ধ করতে এদের কোনও ইচ্ছা নেই।

রাজ্যবাসীর এখন ভাবনার সময় এসেছে তাঁরা এই 'লাল-সবুজের পালা'র দর্শক-শ্রোতা হয়েই থাকবেন না মন থেকে কিছু ভাববেন। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে এটি নিশ্চিত যে, প্রধান বিরোধীদল পরিবর্তন বলতে লাল রঙের ওপর সবুজ রঙের আস্তরণ বোঝেন। ভয় এই সবুজের মাঝখানে আবার না 'সাদা চাঁদ-তাঁরা' এসে পড়ে। সুতরাং বাংলার বিবেকবান ভোটারগণ সাবধান! আপনারা 'লাল-সবুজের পালা' মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন। নিজের বিবেক-বুদ্ধির কাছে প্রশ্ন করুন-আপনারা কেমন পরিবর্তন চান। সিদ্ধান্ত নেবেন খুব ভেবেচিন্তে—শেষবেলায়। আমরা যেন এটুকু অন্তত ভাবি যে আমরা সতর্ক না হলে—আসছে সেদিন ভয়ংকর! সুতরাং সাধু সাবধান!

—অপরাজিতা দেবনাথ, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিবাহ

কয়েকদিন আগে আশুতোষ কলেজ হলে যে বিতর্ক অনুষ্ঠান হয়ে গেল তাতে বিষয় ছিল বর্তমানে নেতাজী ও শ্যামাপ্রসাদের প্রাসঙ্গিকতা। স্বস্তিকার প্রতিবেদক এই বিতর্কের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য করেছেন—এবং তার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে লেনার্ড গর্ডন-এর বইয়ের উপর ভিত্তি করে আমি যে মন্তব্য করেছি তারও সমালোচনা করেছেন। দুটো সম্বন্ধেই আমার একটু বক্তব্য আছে। প্রথমত, কোনও বিষয়ই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। গান্ধীজী যত বড় রাষ্ট্রনায়কই হোন, তাঁর চরকা-তত্ত্ব আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিবাহের ব্যাপারটা তাঁর পরিবার, তাঁর অগ্রজ শরৎ বসু তো মেনে নিয়েছিলেন। এবং অস্ট্রিয়ায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন—লেনার্ড গর্ডন গবেষক হিসাবে এটা লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। বিবাহ তো একটা রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়—ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপার! তা হলে, যদি তাঁর পরিবার তাঁর বিবাহ মেনে নেয় তা হলে অনাত্মীয় আমাদের—আমরা যারা তাঁর গুণমুগ্ধ—আমাদের কী বলার থাকতে পারে। যদি কেউ বলেন—"না, নেতাজী কোনও বিদেশী মহিলাকে বিবাহ করতে পারেন না, দেশ স্বাধীনতা পাবার আগে তো করতেই পারেন না"—তাহলে এই চিন্তাকে সম্মান জানিয়েও আমি বলব, মানুষে দেবত্ব আরোপ করা উচিত নয়, রাজনীতির মানুষকে তো নয়ই!

নেতাজী অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি তো রক্তমাংসের মানুষই ছিলেন!

—তথাগত রায়, কলকাতা।

দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

অধ্যাপক আশিস রায়

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতমাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁর দেশপ্রেম ছিল দুরন্ত ও দুর্জয়। ১৮৯৭ সালে ২৩ জানুয়ারি ওড়িশার কটক শহরে বিখ্যাত বসু পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন পিতা জানকীনাথের ষষ্ঠ সন্তান। জানকীনাথ ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি ছিলেন ধর্মীয় চেতনা ও আধ্যাত্মিক ভাবনায় সমৃদ্ধ। পিতার এই সব গুণাবলী সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সুভাষচন্দ্র এক সুশৃঙ্খল পারিবারিক পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। জানকীনাথ কটকে সরকারী উকিল ছিলেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ও জনদরদী মানুষ। সুভাষচন্দ্রের মা ছিলেন এক দৃঢ়চিত্তের মহীয়সী মহিলা। সুভাষচন্দ্র ছাত্রজীবনে মেধাবী ও কৃতী ছিলেন।

বিশ্ব বিখ্যাত রোমা রলাঁ সুভাষচন্দ্রের মানবতাবাদী মানসিকতা ও সংগ্রামী চেতনার প্রশংসা করেছেন। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্র ছিলেন এক আপসহীন সংগ্রামের সেনাপতি। সুভাষচন্দ্র ছিলেন একাধারে জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে। ভারতমাতার সেবার জন্য আত্মনিয়োগের প্রেরণা নেতাজী লাভ করেন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী থেকে। সুভাষচন্দ্র নিজেকে বিবেকানন্দের আদর্শের অনুগামী হিসাবে ঘোষণা করেন। সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের তারুণ্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য হন। শ্রীঅরবিন্দের মানবিক ও বৈপ্লবিক ভাবনা, আত্মত্যাগ, ভারত-মাতার সেবার আদর্শ সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু হিসাবে স্বীকার করে নেন। দেশবন্ধুর অনুগামী হিসাবে সুভাষচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলা যায় না। রাজনীতির তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী এবং কাজের মানুষ। তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং লেখনী ছিল বলিষ্ঠ। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নিরলস সেনাপতি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর স্থান শীর্ষে। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ছিল সুশৃঙ্খল। দেশ ও জাতি গঠনের কাজে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এইসব কারণে সুভাষচন্দ্রকে কর্মযোগী বলা হয়।

জ ন ম ত

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন আপোষহীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে তাঁর ঠাঁই ভারতীয়দের মনের মণিকোঠায়। তাঁর জাতীয়তাবাদ বিশেষভাবে প্রগতিশীল প্রকৃতির। তাঁর জাতীয়তাবাদের মধ্যে মানবতা শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পাওয়া যায়। তিনি মানবজাতির মুক্তির জন্য এবং বিশ্ব মানবতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। তিনি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন— "[illegible]." তাঁর বাসনা ছিল যে ভারত তার নিজের জাতীয় পতাকা ও সামরিক বাহিনীর অধিকারী হবে এবং বিশ্বের সব স্বাধীন দেশের রাজধানীতে ভারতের রাষ্ট্রদূত পাঠাবে। পরাধীনতার গ্লানি থেকে ভারত ও ভারতবাসী মুক্তি পাবে।

পরিশেষে সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় বাস্তববাদী। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে তিনি মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসাবে দেখেছেন। তিনি এক মুক্ত সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। সুভাষচন্দ্র তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকে কার্যকর করার জন্য [illegible] গঠন করেন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদে আসীন হন। তাঁর ভাষণের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়। তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ছিল উন্নতমানের। মার্কসীয় দর্শনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হননি। মার্কসীয় দর্শনকে তিনি পরিহার করেছেন!

তীর্থপীঠ ক্ষীরভবানী

হিন্দুদের পরম তীর্থস্থান ক্ষীর-ভবানী, তন্ত্রপুরাণ মতে যেখানে সতীর দেহের একান্ন অংশের এক অংশ পড়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ২৩ মণ দুধ ঢেলে দেবীর পুজো দিয়েছিলেন এই পুণ্যস্থানে। লিখেছেন নির্মল কর।

সত্যযুগে রাজা রাবণ লঙ্কায় রাজত্ব করতেন। সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্যের আলোয় ঝলমলে ছিল সেই রাজপুরী। ক্ষমতালোভী রাজা ক্ষমতা ও যশ-লিপ্সায় দেবী পার্বতীকে আরাধনার ভক্তিডোরে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু অহঙ্কারে অন্ধ রাজা পরস্ত্রী হরণের অপরাধে দেবীর কৃপা থেকে বঞ্চি ত হন। লঙ্কারাজের আরাধ্যদেবী লঙ্কাপুরীর কুললক্ষ্মী পার্বতী তাই একদিন রাজ্যপাট অন্ধকার করে চলে এসেছিলেন রামভক্ত হনুমানের সঙ্গে কাশ্মীরের সতীসরে। দেবী পার্বতী এক দরিদ্র নারীর বেশ ধারণ করে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষা করেন। পূর্বপুরুষেরা দেবীকে অতিথিরূপে সাদরে বরণ করে তাঁকে গরুর দুধের ক্ষীর খেতে দেন। তাই তাঁর নাম হয়েছে ক্ষীর-ভবানী।

শ্রীনগর শহর ছেড়ে উত্তরে চল্লিশ কিমি দূরে আছে গরিব অধিবাসী অধ্যুষিত এক অজ পাড়াগাঁ। উত্তরে চিনার গাছের এক ছায়াচ্ছন্ন স্থান, যার পাশ দিয়ে প্রবহমান এক মনোরম ঝর্ণা। চিনার ছায়া-মণ্ডপের তলায় পীঠতীর্থ ক্ষীর-ভবানীর মন্দির। হিন্দুদের এই পরম তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শন করেছিলেন স্বামী রামতীর্থ ও স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ দেবীর পুজো দিয়েছিলেন ২৩ মণ দুধ ঢেলে। তাঁর স্মৃতিচারণে এই পবিত্র তীর্থের কথা বিশদভাবে বলেছিলেন। ছোট হলেও দৃষ্টিনন্দন ক্ষীর-ভবানী মন্দির প্রপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে। চতুষ্কোণ মার্বেল পাথরে সূক্ষ্ম শিল্প-লালিত্যে গড়া এই মন্দির-শীর্ষ সোনার পাতে মোড়া। বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন রাজা প্রতাপ সিং ১৯১২ সালে। আর পূজামণ্ডপও সোনার পাত মোড়াই
করে দেয় ধর্মার্থ পরিষদ জম্মু-কাশ্মীর।

তন্ত্রপুরাণে সতীর দেহের একান্ন অংশের একাংশ পড়েছিল কাশ্মীরে। সেই থেকে কাশ্মীরের শ্রীনগর শহর হয়েছে সতীর পীঠতীর্থ এই ক্ষীর-ভবানী। শ্রুতি—শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশনামায় অনন্তনাগ পৃষ্ঠে ভক্ত হনুমান কর্তৃক রাজা রাবণের লঙ্কাপুরী থেকে মহারাগিনীদেবী, যিনি শ্যামা নামে কথিত কাশ্মীরের সতীসরে আনীত হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মাসের প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে রাগিণীদেবীর পুজো করতেন। রাবণ-জায়া মন্দোদরী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ লঙ্কাপুরীতে রাগিণীদেবীর আরাধনা করতেন শুক্লাষ্টমী ও নবমী তিথিতে। পঞ্চ দশী মন্ত্রে নবরাত্রে দেবীর আরাধনা করলে নাকি দেবীর কল্যাণকর আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

ক্ষীর-ভবানী মন্দিরের দেবতা পার্বতী ও শিব। পার্বতী রক্ত বস্ত্র ও বহুবিধ মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। পার্বতী এখানে ভবানী। শিবমূর্তি পাথরের কিন্তু পার্বতীর মূর্তিটি স্বর্ণ-নির্মিত। রেলিং ঘেরা কুণ্ডের মধ্যে পদ্মফুল, দুধ, আখরোট, পেস্তা বাদাম, কিসমিস, মিছরি ইত্যাকার নৈবেদ্যে দেবীর পুজো করতে হয়। সারা চত্বরটি নানা দেব-দেবীর মূর্তি-বেষ্টিত। মন্দিরের চৌহদ্দির বাইরে দিয়ে ঝর্ণার স্বচ্ছ জলে স্নান-তর্পণ করে ভক্তরা শুদ্ধ হন। এখানকার ঝর্ণার জলের রং ক্ষণে ক্ষণে বদলে যেতে দেখা যায়। জলের রং কখনও লাল, কখনও গোলাপী সবুজ হলুদ কখনও বা দুধের মতো সাদা দেখায়। জলের এই রং-বদলের রহস্য আজও উদ্‌ঘাটন করা যায়নি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে দেবীর বিশেষ পুজো। এ উপলক্ষে ক্ষীর-ভবানী চত্বরে বসে বিরাট এক মেলা। কাশ্মীর শিল্প-প্রধান শহর ব'লে মেলায় বহু বর্ণাঢ্য শিল্প-সামগ্রীর সমাবেশ ঘটে। মন্দিরের সঙ্গে সহজ যোগাযোগের জন্য এই সময় শ্রীনগর থেকে যানবাহনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

কলকাতায় ভূ-কৈলাসের মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

রক্তকমলেশ্বরের আটচালা, ভূ-কৈলাস, কলকাতা (১৭৮০ খৃঃ)।

কলকাতায় আরও যেসব মন্দির লক্ষ্য করা গেছে, তার প্রায় সবই 'আটচালা' ও কিছু 'দালান' বা 'চাঁদনি' রীতিতে তৈরি। খিদিরপুরের 'ভূকৈলাসে' বিশাল আকারের দুটি 'আটচালা'-রীতির মন্দির হলো রক্তকমলেশ্বর ও কৃষ্ণকমলেশ্বরের। দুটি মন্দিরেরই 'চাল' বেশ ঢালু। চালের কার্নিশ বেশ বাঁকানো, অনেকটা খড়ের 'চালা' ঘরের বাঁকানো ছাঁচার মতো, বিশেষ করে রক্তকমলেশ্বরের বিশালাকার, 'আটচালা'র চালের ঢালু ও বক্রভাব খুবই আকর্ষণ করে। ওপরের 'চারচালা'টি নিচেরটির তুলনায় খুব ছোট হলেও তার মধ্যে স্থাপত্যসৌন্দর্য পরিস্ফুট, এটা বোঝা যায়। শীর্ষদেশে অনেকগুলো কলস ওপরে ওপরে বসিয়ে ত্রিশূল সন্নিবেশ করা আছে। রক্তকমলেশ্বরের দেওয়ালগাত্রে বিশেষ কোনও অলংকরণ নেই, নিচের ও ওপরের 'চারচালা'য় পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল ছাড়া। পশ্চি মদিকে ঢাকা বারান্দার বাইরের দেওয়ালের সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি লিপি থেকে জানা যায়, ১৭৮০ খৃস্টাব্দে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এখানে প্রতিষ্ঠাতার নামের কোনও উল্লেখ নেই। অবশ্য জানা যায়, মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল রক্তকমলেশ্বর ও তার বিপরীত দিকে কৃষ্ণকমলেশ্বরের দুটি মন্দিরই প্রতিষ্ঠা করেন।

কৃষ্ণকমলেশ্বরের মন্দিরে (পূর্বমুখী) প্রতিষ্ঠাকালের কোনও উল্লেখ নেই। তবে দুটিরই স্থাপত্য প্রায় একই রকমের। তাই সমকালীন বলে অনুমান। মন্দির দুটির সামনে দক্ষিণপাশে দীঘি। দীঘির দক্ষিণতীরে ঘোষাল রাজবংশের সত্যচরণ ঘোষালের একটি স্মৃতিমন্দির দর্শনীয়। স্মৃতিমন্দিরটির গোল 'গথিক' থাম ও গম্বুজ সেকালে য়ুরোপীয় ঐশ্বর্যময় সমাধিমন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মৃতিমন্দিরের ভেতরে সত্যচরণ ঘোষালের এক উপবিষ্ট মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই স্মৃতি মন্দিরের দেওয়ালে মারবেল পাথরের একটি লিপি থেকে জানা যায়, ১৮৪২ খৃস্টাব্দে এটি তৈরি হয়।

রক্তকমলেশ্বর ও কৃষ্ণকমলেশ্বর মন্দির দুটির উত্তরপাশে একটি ভগ্ন দালানের শুধুমাত্র গোল থামগুলি খাড়া আছে। পাশে জীর্ণ ভগ্ন রাজবাড়ি। রাজবাড়ির অন্দরমহলে পতিতপাবনী দুর্গার 'দালান' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণমুখী মন্দিরটির সামনে বাঁধানো চত্বর। প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে দালানে ওঠা যায়। 'দালানে'র দুটি অংশ ঃ 'ত্রিখিলান' চৌকো খাসযুক্ত প্রশস্ত প্রবেশপথ। খিলানের সঙ্গে 'ফ্যানলাইট' থাকায় বারান্দার সঙ্গে দুকোণে দুটি ছোট্ট পড়লেও ছাদের ওপর রেলিং দেওয়া বারান্দার সঙ্গে দু'কোণে দুটি ছোট্ট 'আটচালা' প্রতীক মন্দির ও কার্নিশের মধ্যবর্তী স্থানে তিনটি বিশিষ্ট রীতির মন্দির এই 'দালান'-শৈলীকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে, যা সচরাচর দেখা যায় না। এই মন্দির ও অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হলে পূর্বদিকের একটি দ্বারপথ দিয়ে আসতে হয়।

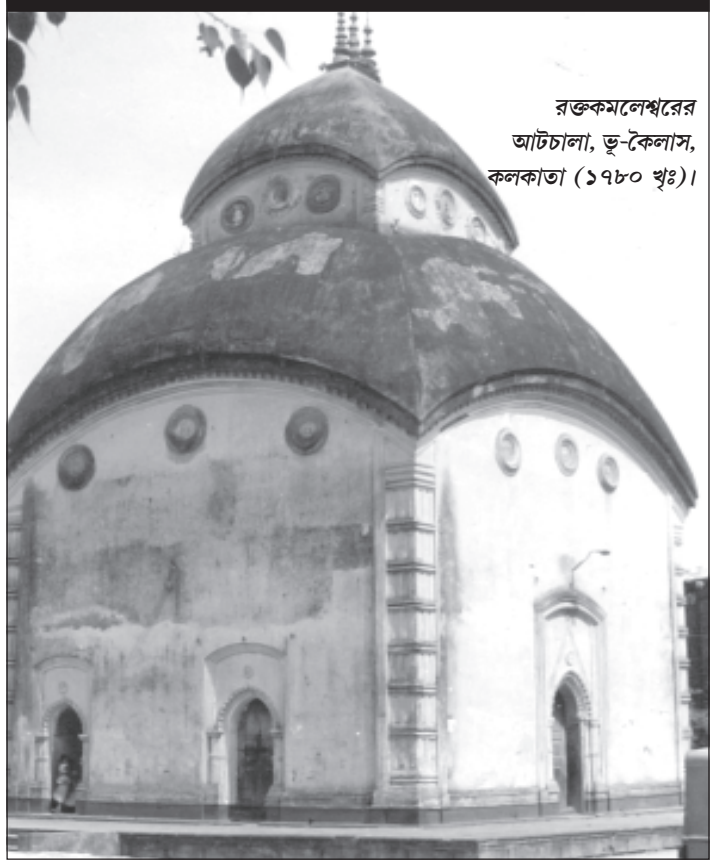

'দালান'টির ঢাকা বারান্দার পর প্রশস্ত গর্ভগৃহে দুর্গামূর্তি বর্তমান। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় সমারোহ করে এখানে পুজো হয়। পতিতপাবনী দুর্গা ঘোষাল রাজবংশের কুলদেবী। দেবীমূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী। মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের প্রতিষ্ঠিত। দুর্গা দালানের দুপাশে দুটি প্রকোষ্ঠ। ঢাকা বারান্দা ও গর্ভগৃহ খুবই প্রশস্ত। সেকালে পুজোয় বহু জনসমাগত হোত বোঝা যায়। জবাফুলের মালায় গোটাটা ঢাকা থাকায় মূর্তির আসলরূপ বোঝা যায় না। তবে প্রাচীন মূর্তির মুখমণ্ডল দেখে এটি যে ক্ষুদ্রাকৃতি মহিষমর্দিনী মূর্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই 'দালানে'র কয়েকটি স্থানে ইংরাজি, ফার্সি ও সংস্কৃতে খোদাই করা লিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বারান্দা ও দর্শককক্ষের পূর্বদিকের দেওয়ালে একটি তাম্রফলকে প্রথমে পঁচিশ সারির ইংরাজি লিপি ও তার নিচে বারো সারির ফার্সি লিপিতে ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের জীবনী ও রাজবাড়ির ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ইংরাজি লিপির প্রথমে আছে ঃ 'ক্ষন্দ্রন্দ্ব ক্ষন্দ্র ত্তক্ষড্রন্থ্রন্দ্ধ ণ্ণক্ষন্তুব্দ্রন্ত্ ঞ্চড়্সব্দব্ধ্রত্তপ্ত', বারান্দার একেবারে বাইরের দেওয়ালে ডাইনে ও বামে কালো পাথরে ঘোদিত দীর্ঘ সংস্কৃত লিপি বর্তমান। বামে একটি কালো পাথরে বড় ছয় সারির লিপি (সংস্কৃতে) থেকে জানা যায়, ১৭৮১ খৃস্টাব্দে জগৎপতিতপাবনী দুর্গা করুণা করে এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই স্থান ছিল উদ্যান দীর্ঘিকা শোভিত, যেখানে অজস্র সুগন্ধি পুষ্পের সমারোহ হোত। এটা শিবের কৈলাসের মতো ছিল। পৃথিবীতে একে বলে ভূকৈলাস।

লিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের সময়ে এই 'দালান' মন্দিরে পতিতপাবনী দুর্গা অধিষ্ঠিতা হন। এর এক বছর আগে ১৭৮০ খৃস্টাব্দে রক্তকমলেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়নারায়ণ ঘোষাল আনুমানিক ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোনও এক সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

শতবর্ষের আঙিনায়

ডঃ রমা চৌধুরী এক মহাজীবন

মিতা রায়

ছয়/সাতের দশকে বাংলা সংস্কৃতি জগতে বাংলা নাটকের যেমন রমরমা ছিল, তারই পাশাপাশি সুনামের সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সংস্কৃত নাটক মঞ্চ স্থ হোত। তার মূলে ছিল 'প্রাচ্যবাণী' প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত সম্পর্কে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, তিনি ছিলেন সে সময়কার খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। এক কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন ভারতের সংস্কৃত নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ।

২০১১-এর ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর শতবর্ষের উদযাপন। এমন একজন প্রাজ্ঞজনের মূল্যায়ন করা মহিলাদের কাছে খুবই জরুরি।

শৈশব থেকেই তাঁর ওপর ছিল কৃতী দাদামশায়দের প্রভাব। তিনি ছিলেন তৎকালীন ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসুর পৌত্রী এবং বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর দৌহিত্রী। পিতা ছিলেন তৎকালীন স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার সুধাংশুমোহন বসু। ফলে পারিবারিক প্রভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মেধাবী। পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করেন। দর্শনশাস্ত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। সেখানেও উনি হন প্রথম বাঙালি মহিলা ডক্টরেট।

চাকরিজীবনের শুরু লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে অধ্যাপনার কাজ দিয়ে। পরে অধ্যক্ষা হিসেবে ওই কলেজে আঠারো বছর ছিলেন। ১৯৬৯-এ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন এবং সেখান থেকেই '৭৫-এ অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সংস্কৃত এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়েছিল তাঁর স্বামী ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরীর সাহচর্যে। স্বামী ছিলেন শিক্ষাবিদ, আধুনিক সংস্কৃত নাট্যকার, কবি, গবেষক এবং সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। এছাড়া, 'বঙ্গবিধুর জননী সভা'র সম্পাদক। সংস্কৃত ভাষাকে দেশ-বিদেশে প্রসার করতেই যুগ্মভাবে গড়ে তোলেন

'প্রাচ্যবাণী'— যার মাধ্যমে বহু সংস্কৃত নাটক-গান ইত্যাদি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রচার করা হোত।

শুধু কি নাটক! রমা চৌধুরী ছিলেন লেখিকাও। সংস্কৃত ভাষায় বহু কবিতা লিখেছেন, অনুবাদও করেছেন। দর্শন সম্বন্ধীয় যেমন নিম্বার্ক ও বেদান্ত দর্শন ছাড়া, বাংলা ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে চল্লিশটিরও বেশি বই রচনা করেছেন।

ডঃ রমা চৌধুরীর পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের থেকে সকলেই প্রায় দূরে থাকতেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই সহজ সরল। শীর্ণকায়া চেহারার মধ্যে ছিল কর্মঠ শক্তি। যাঁরা তাঁর কাছাকাছি গেছেন, বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীরা, তারা সকলেই তাঁর স্নেহসিক্ত পরশ পেয়েছেন। সবচেয়ে উল্লেখ্য এটাই যে, চৌধুরী দম্পতি নিঃসন্তান হলেও তাঁদের অতিথিবাৎসল্য ছিল দৃষ্টান্তমূলক। অতিথিপরায়ণতার পাশাপাশি ছিল ইংরেজি প্রথামত শৃঙ্খলাবোধ। তিনি ছিলেন কারোর কাছে দিদি;কারোর মা।

আমারও একবার সুযোগ ঘটেছিল তাঁর বাড়ি যাবার। তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। জ্বর হয়েছিল। বাড়ি গিয়ে দেখি দুটো বিনুনি করেছেন। অসুস্থ হলেও বলিষ্ঠতা চোখে মুখে। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল রাশভারি মহিলা। কথায় কথায় অনেক সময় পর চলে আসতে চাইলে বললেন— কি, চলে যাবে? না, তা হবে না। আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কি জানি, কিছু ভুল করলাম নাকি। কিছুক্ষণ পর রান্নাঘর থেকে একটা ছোট্ট বাটিতে মিষ্টি এনে বললেন— আগে এটা খাও। তারপর যাবে। তখনই বুঝেছিলাম অতিথিপরায়ণতা কতখানি!

রমা চৌধুরী বাংলা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম মহিলা ফেলো, ১৯৪৬, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যা এবং রামকৃষ্ণ মিশন-সহ বহু সাংস্কৃতিক ও বিদ্বৎসভা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'প্রাচ্যবাণী' প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা 'প্রাচ্যবাণী'র যুগ্ম-সম্পাদিকার পদে ছিলেন। অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাত্রী-সভানেত্রী ছিলেন। তিনি নানাবিধ সংগঠনমূলক কাজে জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। শ্রদ্ধেয়া রমা চৌধুরীকে নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি শুধুমাত্র ব্যক্তি নন, নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর নিরহংকার, সরল, মিষ্টি ব্যবহারের জন্য তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়া একজন আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। তাঁর শতবর্ষের পূর্ণতায় বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি বরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের নিবেদিত কবিতার কটি পংক্তি দিয়ে—

কর্মযজ্ঞে নিবেদিত প্রাণ
আলস্য কভু করেনি তা ম্লান,
লভিয়াছে আজ মহানির্বাণ
আছে শুধু স্মৃতিটাই
নাই, নাই— নাই সে রমাদি নাই।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ২৪

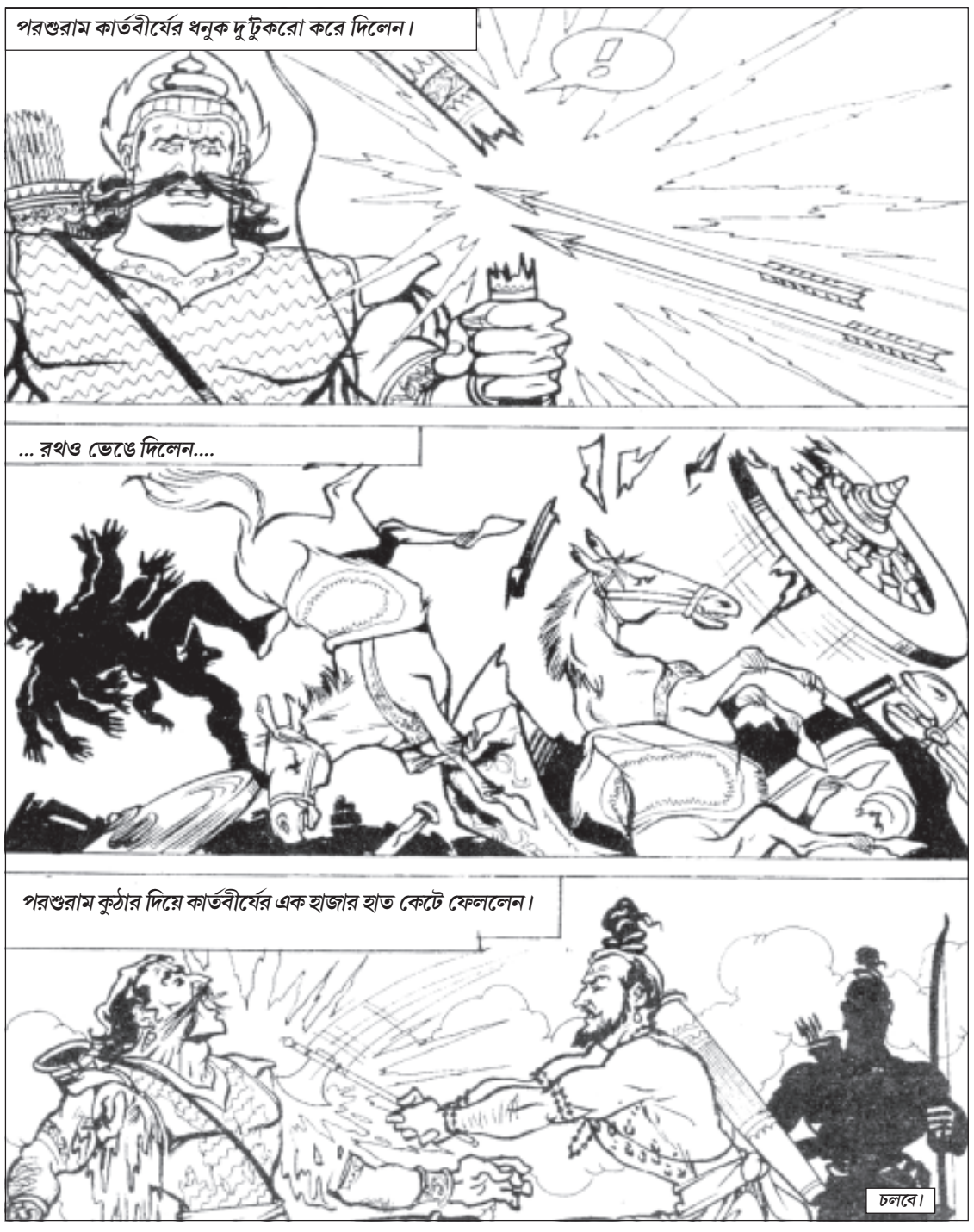

উত্তরবঙ্গে স্বয়ংসেবক সমাবেশের একাংশ। ইনসেটে মোহনজী।ট

সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের উত্তরবঙ্গ সফর

গত ২৩ জানুয়ারি শিলিগুড়ি সারদা শিশুতীর্থ প্রাঙ্গণে উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর স্বয়ংসেবকদের সমাবেশে সরসঙঘচালক মোহনরাও ভাগবত পথ নির্দেশ দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণের মাধ্যমে কার্যক্রমের সূচনা হয়। স্বয়ংসেবকেরা দণ্ড, নিযুদ্ধ, যোগাসন ইত্যাদি শারীরিক কার্যক্রমের প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে মোহনজী বলেন, সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করে দেশকে বৈভবশালী করার জন্য চিন্তা করা প্রয়োজন। মনে যা হচ্ছে বলা এবং সেই অনুসারে কাজ করা মহাপুরুষের লক্ষণ। স্বামী বিবেকানন্দও জীবনে নিজ স্বাভিমান অনুসারে কাজ করেছেন। সুভাষচন্দ্র নিজের জীবন দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। দেশের সামনে ভয়াবহ সমস্যা পাকিস্তান এবং চীন। এই দুই দেশ থেকে আমাদের বিপদ আসছে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। দেশের মধ্যে মাওবাদী নকশাল আন্দোলন হচ্ছে। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও দেশের মধ্যে অশান্তি চলছে। রাষ্ট্রের জন্য কাজ করা তাই আমাদের কর্তব্য।

নবদ্বীপে সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবির

খগেন্দ্রনাথ-উর্মিলাদেবী স্মৃতিভবনে (আগমেশ্বরীপাড়া, নবদ্বীপে) সংস্কৃত ভারতী প্রবর্তিত ও নবদ্বীপ সংস্কৃত সমাজ-পরিচালিত দশদিবসীয় সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের তৃতীয় বর্গের সমারোপ ও চতুর্থ বর্গের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠিত হলো।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বৃন্দাবনধর গোস্বামী। প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য ও শান্তিময় ভট্টাচার্য। শিক্ষার্থীগণকে স্বাগত অভিনন্দন জানান সংযোজক ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী।

খানাকুলে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

এই প্রথম খানাকুলে সংস্কৃত-ভারতীর উদ্যোগে গত ১৩ জানুয়ারী থেকে রামনগর অতুল বিদ্যালয়ে সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ষাট-জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক হিসাবে ছিলেন কমলাকান্ত মিস্ত্রী। ২২ জানুয়ারি সমাপন কার্যক্রম হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ এলাকার বহু সংস্কৃতানুরাগী উপস্থিত হয়ে সংস্কৃতভারতীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। প্রধান বক্তা ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ।

উত্তর দিনাজপুরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির

উত্তর দিনাজপুর জেলার দরিমানপুর সারদা শিশুতীর্থের প্রাঙ্গণে ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ শতবার্ষিকী স্মরণ উপলক্ষে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির বালিকা শিবির ১৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে ৪২ জন বালিকা ও ৪ জন প্রবন্ধিকা ও ৪ জন শিক্ষিকা ছিলেন। বুলি বর্মণ, বুলি সরকার, রত্না সরকার, সন্ধ্যা সরকার, ভারতী বর্মণ প্রমুখদের ব্যবস্থাপনায় দেশাত্মবোধ সঙ্গীত, যোগাসন, যোগব্যায়াম, খেলাধূলা ও সবশেষে অনুভব প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিবিরের সমাপ্তি ঘটে।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

সমাজ সেবা ভারতীর পরিচালনায় গত ২ ডিসেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর যথাক্রমে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া সঙঘ কার্যালয়ে ২টি অর্শ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডাঃ বি, সি, সাহা ইঞ্জেকশন পদ্ধতিতে মোট ৫৯ জন রুগীর চিকিৎসা করেন।

সমাজ সেবা ভারতীর পরিচালনায় গত ১১ এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০১০ যথাক্রমে বর্ধমান জেলার বুদবুদ এবং নিয়ামতপুরে ২টি অর্থ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরগুলিতে ডাঃ বি সি সাহা মোট ৯৯ জন রুগীর ইঞ্জেকশন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন।

হাওড়া জেলাতে হিন্দু সম্মেলন

হনুমতশক্তি জাগরণ সমিতি হাওড়া জেলার উদ্যোগে গত ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত হাওড়া জেলাতে মোট ১৩টি স্থানে হনুমত শক্তি জাগরণ যজ্ঞ ও হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হলো—পাঁচলা থানার রানীহাটী, জগৎবল্লভপুর থানার মুন্সীরহাট, উদয়নারায়ণপুর, আমতার নওপাড়া, বাগনান ও উলুবেড়িয়া।

গত ২৬ ডিসেম্বর রাণীহাটি পুরাতন বাজারে পাঁচলা সঙেঘর হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য হলো— এই সম্মেলনে প্রায় ৪৫০০ যুবক ও ২০০০ মাতৃমণ্ডলীর উপস্থিতি ব্যাপক সাড়া জাগায়। এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক। এছাড়াও ছিলেন হাওড়া জেলা হনুমত শক্তি জাগরণ সমিতির সভাপতি পূজ্যপাদ সর্ববেশানন্দ সরস্বতী মহারাজ (বেদান্তমঠ, বীরশিবপুর)। শিবচৈতন্য মহারাজ ও রাণাপ্রতাপ রায়। বক্তব্যের ফাঁকে জনসমুদ্রকে জয় শ্রীরাম ও বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে উৎসাহবর্ধন করে পুরো

সমাবেশ সমাচার

মঞ্চ সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন শুভেন্দু সরকার।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান

গত ১২ ডিসেম্বর '১০ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর আসানসোল জেলার চিত্তরঞ্জন নগরে দুটি আলাদা আলাদা বিবাহ অনুষ্ঠানে আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সম্পর্ক প্রমুখ জুগল কিশোর সিং তাঁর পুত্র সুরজ কুমারের বিয়ে উপলক্ষে এবং চিত্তরঞ্জন সাংগঠনিক মহকুমা সহ কার্যবাহ অভিজিত মজুমদারের বিয়ে উপলক্ষে তার বাবা রমেন্দ্রকিশোর মজুমদার দক্ষিণবঙ্গ সহ শারীরিক প্রমুখ পঙ্কজ কুমার মণ্ডলের হাতে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

সংশোধনী

গত ৩১ জানুয়ারি সংখ্যায় ৮-এর পাতার 'শীতকালেও পেঁয়াজ সহ সমস্ত আনাজপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি কেন?'—শীর্ষক লেখাটির পরবর্তী অংশ ১৪ পাতায় যাবার কথা থাকলেও যায়নি। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলে জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। — সঃ স্বঃ

স্বস্তিকার দাম

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

করাচির নাট্যপ্রেমীদের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর অভিনয়

কিরণশঙ্কর মৈত্র ॥ তারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা দ্বারা আয়োজিত দ্বাদশ ভারতরঙ্গ মহোৎসব যোগ দেবার জন্য, তাদের 'শকুন্তলা' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে। কিন্তু করাচিস্থিত নাট্যমোদী জৈন আহমদ এবং তার দলের নাট্যশিল্পীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন ভারত-ভ্রমণের ভিসা তারা পাবেন কিনা। নববই দশকের মাঝামাঝি সময়ে করাচির ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ পারফর্মিং আর্টস-এর জৈন আহম্মদ থিয়েটার স্টুডেন্ট হিসেবে কালিদাসের প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকাব্য 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'-এর কথা জানতে পারেন এবং এই কাব্যের নাট্যসৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন আহমেদ হিমেশ এবং তার নবনাট্যরূপ দেন ডিরেক্টর জৈন। আহম্মদকাব্যের প্রধান অংশগুলি গ্রহণ করে তিনি অধিকতর জোর দিয়েছিলেন দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম-কাহিনীর উপরে। সর্বোপরি ছিল নিয়তির নিয়ন্ত্রণ। যাই হোক, অবশেষে ভারত নাট্য মহোৎসবে যোগ দেবার ভিসা তারা পেয়ে গেলেন।

জৈন আহম্মদ তার কুশীলব নিয়ে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের দর্শকদের জন্য 'শকুন্তলা'র প্রথম অভিনয় করেন। একদম নতুন ধরনের কাহিনী হলেও নাট্যরূপটি তাদের সানুরাগ সমাদর লাভ করে ওর সার্বজনীন আবেদনের জন্যে।

দিল্লি-অভিনয়ের আগে ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে জৈন আহম্মদ পরিচালিত 'শকুন্তলা'-অভিনীত হয় অমৃতসরে সাউথ এশিয়ান পীস ফেস্টিভ্যালে।

ইংরেজিতে 'রামলীলা'

অক্টোবর মাসে দিল্লিতে কমনওয়েলথ গেমস-এর কথা মনে রেখে নবরাত্রির সময়ে বিদেশি দর্শকদের জন্য রেড ফোর্ট গ্রাউন্ডে 'রামলীলা'র সময়ে ইংরেজি অনুবাদ, প্যাম্পলেট এবং এয়ার কন্ডিশন্ রুমের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রী ধার্মিক লীলা কমিটির রবি জৈন জানিয়েছিলেন— বিদেশি ট্যুরিস্টদের জন্য আলাদা বিভাগে রামলীলার ইংরেজি অনুবাদ এবং তার তাৎপর্য বর্ণনার উত্তম ব্যবস্থা, ইংরেজি পুস্তিকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষিত। এছাড়া বড় স্ক্রিনে ইংরেজি সাবটাইটেল।

এইসব ব্যবস্থার ফলে বিদেশি দর্শকরা 'রামলীলা' অনুধাবন করে এই সব আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী মিথ ভেঙে গেছে

(৯ পাতার পর)

করার জন্য সব জায়গা ছেড়ে তিনি সুদূর আমেরিকার মিনিয়াপলিস পাড়ি দেন। ফিরে এসে পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী থাকবে কি থাকবে না তার বিধান দিতে থুন্দ্ব ক্কট্রক্সপ্পপ্পন্দব্দন্দক্সচ্চ- এর কর্ণধার হন। দু'হাতে বাঙলায়, ন্দচ্চন্ধক্কন্দ-ন্ধন্দক্ক-এর পি এইচ ডি বিলোতে থাকেন। কে কাকে দ্যাখে। পরিতাপের কথা, পরবর্তীকালে অমন দুর্লভ পি এইচ ডি-টির সততা নিয়েই ব্যাপক সরগোল পড়েছিল যা অনেকেই জানেন। যাই হোক, এই সক্রিয় চক্র দলের নীতিকেই সর্বত্র চাউর করে শিক্ষাক্ষেত্রে এক মধ্য মেধার রাজত্বে কায়েম করেছে। যার ফলাফল হয়েছে ভয়াবহ। আজ সর্ব ভারতীয় প্রশাসনিক পরীক্ষায় বাঙালী ছেলে-মেয়েরা প্রায় উবে গেছে। চাকুরী ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য প্রথম শর্ত হওয়ায় সরকারী ক্ষেত্রগুলিতে লিখিত পরীক্ষার গন্ডী পেরোলেও চ্চন্ধন্দ্বক্ক্ষন্দ্বভ্র-এ দলীয় আনুগত্যের লোকই চাকরি হাতিয়ে নিচ্ছে। দলতন্ত্র শক্তিমান হচ্ছে।

চালে ভুল

পশ্চিমবঙ্গের শাসকশ্রেণী বরাবর উদারীকরণের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। এখন বলার এই উদারীকরণ মূলত দু' রকমের (১) রাজনৈতিক উদারীকরণ— যেমন, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলে তা থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্তরণের চেষ্টা, বাকস্বাধীনতা, ভিন্ন মতলম্বীদের স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি এবং (২) অর্থনৈতিক উদারীকরণ— যা আদতে পুঁজির স্বাধীনতা। কিন্তু তা কখনই রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে উল্লঙঘন করতে পারে না। এখানেই এই মাঝারি মেধার ক্ষমতালোভী শাসকেরা তাদের অন্তিম ভুলটি করে। কারখানার জন্য নন্দীগ্রামে জমি দখল করতে গিয়ে মানুষের প্রতিবাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে দমন করে। গুলি চালিয়ে মানুষ মেরে পুঁজির স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে যায়। এখানেই এতদিনকার বুদ্ধিজীবীকুল নড়েচড়ে বসে। ভাববার কোনওই কারণ নেই এই প্রতিবাদী গোষ্ঠী বরাবরই প্রতিবাদী ছিলেন। কখনই না। নন্দীগ্রামে হার্মাদের গুলিতে আনা ব্যর্থ 'সূর্যোদয়ে' চরম সর্বনাশ হয় এই এত কালের 'বাঁধা বুদ্ধিজীবীকুলের' বোধোদয়ে। তাঁরা প্রতিবাদ করেন। তাই আজ শাসককুল সর্বার্থেই আতঙ্কিত নাজেহাল।

উপসংহার

শাসককূলের হতাশা ভীতি ও দিশেহারা অবস্থার মূল কারণ এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবী দলের ভোল পাল্টানো। বুদ্ধিজীবী মানে বামপন্থী মূল অর্থে কম্যুনিস্ট হতে হবে। এই মিথটাই ধসে পড়েছে। মিথ হচ্ছে এমন বস্তু যেটি আদতে অসত্য জেনেও স্বভাব ও অভ্যাসবশত লোকে তাকে অবিশ্বাস করতে চায় না, ঝেড়ে ফেলতে মন না। স্বস্তিকার এক বন্ধু তপন একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিল। বাঁদরের বাচ্চা মারা যাওয়ার পর জন্মদায়িনী বাঁদরটি কিছুতেই তাকে ছাড়তে চায় না। ভয়ে, অবিশ্বাসে তাকে জড়িয়ে থাকে। আমাদের এখানেও অনুরূপ একটি অবস্থা চলছে। সোভিয়েতের পতনের পর সারা বিশ্ব থেকে কম্যুনিজম মুছে গেছে। চীনে এক ধরনের ধনতান্ত্রিক দলতন্ত্র চলছে। কোন বিরোধিতার জায়গা সেখানে নেই। অথচ আমাদের এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাবতীয় সুবিধা ভোগ করে দলীয় অফিসে সেই কুখ্যাত স্টালিন, মাও জে দং-এর ছবি পুজো করে তাঁরা যে দলতন্ত্র দানবতন্ত্র কায়েম করেছিলেন আর দীর্ঘ নির্জীবতায় ভোগা যে বুদ্ধিজীবীকূল তাকে নিঃশব্দে মান্যতা দিয়েছিলেন, সেই নিশ্চিতিটিই আজ টলমল।

বুদ্ধিজীবী মানেই বামপন্থী এই কৌশলী কুসিদ্ধান্তটিই আজ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। টিভি, কাগজে তৃতীয় শ্রেণীর কিছু লেখক, অভিনেতার এমন কাদায় পড়া থেকে দলকে উদ্ধার করার মতো পরিচিতি, গুণ বা বিশ্বাসযোগ্যতা কোনওটাই নেই। হায়! ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দে।

বইমেলা, আঙুল তুলে কথা বলা এবং মন্ত্রীমশাই

রমাপ্রসাদ দত্ত

'কোনও ভদ্রসন্তান আঙুল তুলে কথা বলে না। কারণ তা শিষ্টাচারসম্মত নয়' এই বাক্যদুটো আমরা অনেকেই শুনেছি ছেলেবেলায়। সব বাড়িতে না হোক অনেক বাড়িতেই ওই শিক্ষা পাওয়ার পরিবেশ ছিল। স্কুলে মাস্টারমশাইরা বলতেন। তাঁরা কেউ কেউ আঙুল উঁচিয়ে কথা বলতেন। যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগত। আঙুল না তুলেও শাসন করা যায়, শারীরিক মানসিক অত্যাচার না করেও ছাত্রদের মনোযোগী করা সম্ভব— আমাদের পরিচিত অনেক শিক্ষক বলতেন। কিন্তু কুশিক্ষা রপ্ত করে তা প্রয়োগের লোকজন চারপাশে কম নয়। ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের এখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি স্কুল কলেজে পড়ার সময় থেকেই আঙুল তুলে কথা বলতে অভ্যস্ত—এরকম শুনেছি। তবে তার যে ওই অভ্যেস পুরোমাত্রায় রয়েছে তা দেখেছি সরকারের মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে। প্রথমে তথ্য মন্ত্রী হয়ে রাজা-উজির মারার অভ্যেস রপ্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কোনওরকম বিরুদ্ধ-মতকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। তিনি চেয়েছিলেন যারা অন্যকিছু ভাবতে বা বলতে চায় তাদের বিভিন্ন কৌশলে টিট করতে হবে। এজন্যে তিনি সরকারি বেতনভুক এবং মন্ত্রী তোয়াজে দক্ষ কিছু আমলাকে খাতিরের বৃত্তে এনেছিলেন।

মুশকিল হলো তিনি বুঝতে পারেননি কাজগুলো রাশিয়ায় বা চীনে বসে করছেন না, কেউ জানার সুযোগ পাবে না কোথায় কি কৌশলের ছক তৈরি হয়েছে। যতই ঢাক ঢাক গুড়গুড় করুন না কেন সব প্রকাশ পেয়েছে। এমনকী প্রতিদিন সন্ধ্যেয় নন্দন-এর বিশেষ ঘরে বসার উদ্দেশ্যও গোপন রাখা সম্ভব হয়নি।

সেদিনের তথ্যমন্ত্রীর তর্জনী ফুলে কলাগাছ হয়নি তখন, তার মনে যে অনেক চর্বি জমেছে দিনে দিনে সেটা বোঝা যায় সহজে। তাঁর তর্জনী শাসনের শিক্ষা কোথায়? পারিবারিক পরিবেশে? রাজনৈতিক দলে' না স্কুলে? হয়তো বলতে পারতেন তাঁর বাবা মা। তাঁরা দুজনেই নেই। তার মানে জীবনাবসান হয়েছে। যে কোনও মানুষের সদাচরণ এবং বদাচরণের সঙ্গে তার বাবা-মার শিক্ষার ব্যাপারটা থাকে। 'বর্ণপরিচয়'-এর ভুবন শেষকালে কি করেছিল? তার সর্বকার্য প্রশ্রয়দাতা মাসির কান কামড়ে নিয়ে বলেছিল, 'মাসি তুমিই আমার ফাঁসির কারণ।' বাল্যের কুশিক্ষা বা সুশিক্ষা সারাজীবন বয়ে বেড়াবে প্রত্যেকটি মানুষ। মার্কসবাদ পড়া (কতটা পড়েছেন জানি না। তবে বুঝেছেন খুব সামান্যই) মন্ত্রীমশাই আত্মপ্রেম এবং আত্মজাহিরে পটু বরাবর। সে উত্তর কলকাতায় তাঁর জীবনের কিছুটা সময় কেটেছে তখন যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা বলেন, নিজের ধান্দা ছাড়া আর কিছু জানত না।

শোনা কথায় কাজ নেই। আমরা তাঁর আঙুল তোলা নিয়েই কিছু বাক্যরচনা করতে চাই। আঙুল বিভিন্ন জনের শারীরিক গঠন অনুযায়ী একেক রকম রূপ নেয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রত্যেকের আঙুল আর করলেখা আলাদা। তার সঙ্গে স্বভাব মেজাজ সবই জড়িয়ে থাকে। একই মার্ক্সবাদের পাঠ এখনকার মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নিয়েছেন, সেভাবে নেননি তাঁর একদা গুরুস্থানীয় প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদবাবুর চুরুট খাওয়া আঙুলে তামাকের দাগ ছিল। তিনি কট্টর মার্ক্সবাদী ছিলেন, অনেক কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেন দল চালনোর জন্য। তবে মুখোশ পরাতেন না কোনও। ফলে তাঁকে সহজে চেনা যেত। আর তিনি কখনও আঙুল উঁচিয়ে কথা বলতেন না। রাজ্যের এখনকার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদবাবুর সঙ্গে চীনে গিয়েছিলেন। প্রমোদবাবু দেশটাকে চিনতে দেশের মানুষকে বুঝতে গিয়েছিলেন। আর তার সঙ্গী কমরেডের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম প্রমোদ সন্ধান। বৃদ্ধ প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁর প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বাঙালি কমরেড সঙ্গীকে পাননি।

প্রমোদবাবু ফিরলেন স্বদেশে। তাঁর প্রাণ ছিল না তখন। চীনে কোনও অবস্থায় কেন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন তা রহস্যময় অনেকের কাছে আজও। আঙুল তুলে কেউ কি সঙ্গীটিকে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন? অজানা রয়ে গেছে এখনও।

কারণ?

ফিরে আসতে চাই আঙুল প্রসঙ্গে। মন্ত্রীমশাই তামাক খেতে অভ্যস্ত স্কুলে পড়ার সময়ে থেকে। উত্তর কলকাতার শৈলেন্দ্র সরকার স্কুলে যখন ছাত্র ছিলেন তখনই বিড়ি খেতে শেখেন। পরে সেটা বেশ রপ্ত হয়ে যায়। মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে দামী বিদেশি সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস বজায় রেখেছেন। অনেক জায়গাতেই এখন ধূমপান নিষিদ্ধ। কিন্তু মন্ত্রীমশাই দিব্যি টেনে যান তামাক। কলকাতা বইমেলায় ঘন ঘন মাইকে ঘোষণা শুনেছি, 'ট্রামে বাসে ধূমপান করবেন না।' মন্ত্রীমশাই মেলা আয়োজক সংস্থা গিল্ডের অফিসে বসে বশংবদ প্রকাশক-পরিবৃত হয়ে একটার পর একটা দামি সিগারেট খেয়ে নিজেকে গ্রন্থপ্রেমী হিসেবে জাহির করতেন। আশপাশে বসে থাকা বিদেশিরা কিন্তু তামাক ছুঁতেন না। আর কাউকে তামাকে খেতে দেখা যেত না। মন্ত্রীমশাইকে কাগজের লোকরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি সিগারেট খাচ্ছেন? তিনি আঙুলে সিগারেট রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে গিল্ড। আমি তো করিনি। গিল্ডের কথা মুখ্যমন্ত্রী মানবে কেন? আমি সিগারেট খেতে ভালোবাসি। আপনারা যা খুশি লিখুন। কিছু যায় আসে না।'

তিনি সিগারেট খেয়েছেন একটার পর একটা— ১৯৯৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বইমেলা পোড়ার দিনেও। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা প্রবলভাবে পাওয়া এক প্রকাশকের কারসাজিতে পাওয়া একটা খাবারের দোকান থেকে আগুন লেগেছিল। আগুন ছড়িয়ে যায় মাঠে গিল্ডের অপদার্থতায় আর দমকল বাহিনীর দায়িত্বহীন কাজকর্মে। মন্ত্রীমশাই তাঁর রাজনীতি আর ক্ষমতার ছাতার নিচে এনে রক্ষা করেছিলেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সেই মাতব্বরকে। তারপর মন্ত্রীমশাই সেই প্রকাশকের মাধ্যমে গিল্ড দখলে এগিয়ে যান। তাকে সম্পাদক করার জন্য মন্ত্রীমশাই এমনভাবে তৎপরতা দেখান যাকে দুটো শব্দে বলা যায়— নির্লজ্জ মতলবী। যেমনটা তিনি করেছিলেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর প্রধান পদটি বশংবদ পুলিশকর্তাকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য। কাজ হাসিল করে খুশিতে দু'জায়গাতেই, সিগারেট ধরিয়ে মন্ত্রীমশাই আঙুল তুলে বলেছেন, কি পারলেন কেউ আটকাতে? যা মনে করবো, তা করে ছাড়বো।'

প্ররোচনা দিয়েছিলেন তিনি গিল্ডওয়ালাদের ফৌজ, কেন্দ্রীয় সরকার কাউকে তোয়াক্কা করতে হবে না। আমি মন্ত্রী, রাজ্য সরকার আর আমার দল ময়দানে মেলা করবেই। দরকার হলে ময়দানের ওই জমি রাজ্য বিশেষ আইনে দখল করার।' সে সব কথাবার্তাও আঙুল উঁচিয়ে। গিল্ডের মাতব্বরা বলতে পারেনি, 'আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি অন্য জায়গায় মাঠ জোগাড় করে দিন।' মন্ত্রীমশাই আত্মজাহির আর আত্মপ্রচারের অঙ্ক কষেছেন ক্রমাগত। আর গিল্ডের বশংবদরা তার কীর্তিতে বিভোর হয়েছেন। বলেছেন, 'মন্ত্রীমশাই সব করে দেবেন। গাইয়ে দেবেন।' কলকাতা বইমেলা চিরদিনের মতো উঠে তো গেছে। চলে যেতে বাধ্য হয়েছে ময়দান থেকে। মন্ত্রীমশাই আঙুল তুলে বলেছেন, আমি ময়দানে মেলা ফিরিয়ে আনতে না পারলে ব্রাহ্মণ সন্তান কমরেড নই। সেজন্য তিনি সিগারেট স্পর্শ করবেন না—এমন পণ করেননি। জানেন রাজনীতি করার জন্য অনেক কথা বলতে হয় সামনে, তা ভুলে যেতে হয় সঙ্গে সঙ্গে।

১৯৯২ সালে মহাকরণে প্রেস কর্নার ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তিনি। দলীয় গুন্ডা আর পুলিশ দিয়ে সাংবাদিকদের জব্দ করতে চেয়েছিলেন। সেসময় এক মহিলা সাংবাদিককে ওই গুন্ডারা লাঞ্ছনার চেষ্টা করলে সাংবাদিকরা রুখে দাঁড়ায়। পুলিশ আর দল-মস্তানরা সাংবাদিকদের পেটায়। মূল ব্যাপার হলো, সাংবাদিকদের বশংবদ করা যায়নি। তারা অনেক কিছু রাখঢাক না করে ছেপে দিচ্ছিল। মন্ত্রীমশাই তখন তথ্যমন্ত্রী। ভাবলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন সাংবাদিক দমন দরকার। রাইটার্সে বিল্ডিং-এর প্রেস কর্নারে বসে গুলতানি করবে সাংবাদিকরা আর সরকারের বিরুদ্ধে লিখবে— এটা মানা যায় না। মন্ত্রীমশাই হিংস্র চেহারা নিলেন। ডাক দিতেই এসে গেল দলীয় মস্তান আর পুলিশ একসঙ্গে। সেসময় আঙুল উঁচিয়ে গলাবাড়িয়ে আত্মসাফাই গেছিলেন মন্ত্রীমশাই। একটা দৈনিকে ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে লেখা ছাপা হলো : আঙুল নামিয়ে কথা বলুন মন্ত্রীমশাই। পরের দিন প্রেসক্লাবে সেই লেখা নিয়ে আলোচনা। কেউ কেউ লেখেন, 'সময়োচিত থাপ্পড়। কিছু হিংস্র মন্ত্রী কাজের উপর হামলা করবেই।' সেই কাগজের সাংবাদিকদের বললেন মন্ত্রীমশাইয়ের দলের কাগজের সাংবাদিকরা, এটা ঠিক হয়নি। 'আঙুল তুলে কথা বলা ওঁর অভ্যেস।' সেকথা শুনে জবাব দিলেন এক প্রবীণ সাংবাদিক, 'আঙুল তুলে কথা বলা শিষ্টাচার সম্মত নয়। আমি চল্লিশ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছি, ওই অনেক বড় বড় নেতাকে দেখেছি। কেউ ওইভাবে কথা বলতেন না। বিরোধীদের কথা না শোনা মানেই বিপদ ডেকে আনা। আঙুল তুলে দু'চারজনকে দাবিয়ে রাখা যায়, সবাইকে সম্ভব নয়।' দলীয় কাজের সাংবাদিকরা ধুত্তেরি বলে উঠে চলে গেলেন মদ্য পানের জায়গায়।

না, মন্ত্রীমশাই এখনও আঙুল তুলে কথা বলার অভ্যেস ছাড়তে পারেননি।

পশ্চিমবঙ্গে নবজাগরণ রথযাত্রা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা নবজাগরণ রথযাত্রার মাধ্যমে জনতার দরবারে তৃতীয় বিকল্পের আবেদন নিয়ে হাজির হচ্ছে। গত ৩০ জানুয়ারি কুচবিহার থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং।

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রাণী রাসমণি রোডে যাত্রার সমাপ্তি দিনে বিশাল জনসভা হচ্ছে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সভায় উপস্থিত থাকবেন লালকৃষ্ণ আদবানী, নীতিন গডকরি, অরুণ জেটলি, সুষমা স্বরাজসহ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা।

দলের রাজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে যাত্রাপথে কুচবিহার, শিলিগুড়ি, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা, ফারাক্কা ও কৃষ্ণনগরে বিশাল জনসভা হয়েছে। রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হার নেতৃত্বেই এই যাত্রা চলছে। দ্বিতীয় দফায় হুগলীর সিঙ্গুর থেকে যাত্রা শুরু করবেন প্রাক্তন সভাপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু। ১২ ফেব্রুয়ারি খড়্গপুরে থাকবেন লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ। যাত্রা দেগঙ্গা, বসিরহাট, মালঞ্চ, ঘটকপুকুর, মিনাখাঁয় জনসভা হবে। উলুবেড়িয়া, হাওড়া ছাড়াও বিজেপি জোর দিচ্ছে কলকাতার দুটি জনসভার উপর। ১৩ ফেব্রুয়ারি সত্যনারায়ণ পার্কের জনসভায় বক্তব্য রাখবেন দলের মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী স্মৃতি ইরাণী।

১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় রাসমণি রোডের বড় সমাবেশের উপরই রাজ্য বিজেপি জোর দিচ্ছে বেশি। কলকাতার এই সমাবেশে লোক উপচে পড়বে বলে বিজেপি নেতৃত্বের আশা।

ইতিমধ্যে রাজনাথ সিং, মুরলীমনোহর যোশী, অরুণ জেটলি, চন্দন মিত্র, কীর্তি আজাদ বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন।

রথযাত্রার উদ্বোধনের পরে রাজনাথ সিং, রাহুল সিন্‌হা, চন্দন মিত্র প্রমুখ।

Swastika
14 February - 2011, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

ছবিতে (বাঁদিক থেকে) রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী, মহাবীর বাজাজ, শিবরঞ্জন চ্যাটার্জী, প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, ডঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, প্রহ্লাদ গোয়েঙ্কা, যুগলকিশোর জৈথলিয়া এবং শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস। মুরালভাইকে মানপত্র ও চেক তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদার।

বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে ভূষিত ব্রহ্মচারী মুরালভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'স্বদেশমন্ত্র'-এ বর্তমান ভারতকে আহ্বান করে স্বামীজী যে দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীকে ভাই বলে সেবার কথা বলেছিলেন, ভারতের প্রতিটি ধূলিকণাকে পবিত্র বলে আত্মবিস্মৃত জাতিকে পরানুকরণ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই মন্ত্রকেই স্মরণে রেখে স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে যাঁরা সেবা করে আসছেন, বড়বাজার কুমারসভা গত পঁচিশ বছর ধরে তাঁদের সম্মান জানিয়ে আসছে। সেই সূত্রে এই বছর বিবেকানন্দ সেবা সম্মান-এ ভূষিত হলেন ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। গত ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মহাজাতি সদনে (অ্যানেক্স) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুরাল ভাইকে এই সম্মান জানানো হলো। ১৯৮৭ সালে নাগাল্যান্ডের রাণী গাইদিন ল্যু-কে প্রথম এই সম্মান জানানো হয়। এবারের সম্মান প্রদানটি ২৫ তম।

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' গীতের মাধ্যমে সভার সূচনা। স্বাগত ভাষণে পুস্তকালয়ের পথপ্রদর্শক যুগলকিশোর জৈথলিয়া স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে সমাজসেবার কাজে যোগদানের আবেদন জানান। তিনি বলেন, স্বামীজীই বর্তমান ভারতে আমাদের পথের দিশারী। খৃস্টান মিশনারীরা সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রান্তরকরণের যে ষড়যন্ত্র করেছে তা রুখতে স্বামীজীর প্রদর্শিত সেবাই একমাত্র পথ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজনৈতিক নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদার। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্র এবং প্রহ্লাদ গোয়েঙ্কা।

ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বান্যার্জী মুরালভাইকে মাল্যভূষিত করছেন।

স্বামীজীর সেবাভাবনাকে স্মরণে রেখেই এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরের ব্রহ্মচারী মুরাল ভাইকে বিধিবৎ বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে ভূষিত করে শাল, নারকেল, মানপত্র এবং ৫১ হাজার টাকার একটি চেক তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বনবন্ধু পরিষদ, লিজরাপোল সোসাইটি, সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র পক্ষ থেকেও মাল্যার্পণ করে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে মুরাল ভাই বলেন, লক্ষ জীবন কাজ করলেও বিবেকানন্দের মতো হতে পারবো না। তাঁর প্রদর্শিত পথে কাজ করাটাই হলো মুখ্য।

স্বামী বিবেকানন্দকে 'স্পিরিচ্যুয়াল ফাদার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া' হিসেবে বর্ণনা করে সভার প্রধান বক্তা ডঃ শিবরঞ্জন চ্যাটার্জী বলেন, স্বামীজী হিন্দু সন্ন্যাসী— তবে নিজের মুক্তির জন্য নয়, সকলের সেবার জন্য। যুবক গুরুভাইদের নিয়েই গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শেই সেবা কাজ শুরু করেছিলেন। যুবকরাই ছিল তাঁর আস্থা ও ভরসা। বিবেকানন্দ রাজনীতিক নন, কিন্তু যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই তাঁর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছিলেন। আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সভায় স্বামীজীর প্রথম ভাষণ দেওয়ার দিনটিকেই (১১.৯.১৮৯৭) ভারতের নবজাগরণের প্রথম দিন হিসাবে ডঃ চ্যাটার্জী বর্ণনা করেন। বৃটিশ সরকার নিযুক্ত সিডিশন কমিটির প্রকাশিত রিপোর্টে (১৯১৮) মৃত বিবেকানন্দকে জীবিত বিবেকানন্দের থেকে ভয়ঙ্কর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক বিপ্লবীকে তল্লাসী করে দুটি সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল— একটি গীতা এবং অপরটি স্বামীজীর বই। বিপ্লবী হরি চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ঢাকার জেলবন্দী রাজনৈতিক নেতাদের যখন আলাদা আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আপনি কি বিবেকানন্দকে পূজা করেন? তখন প্রত্যেকেই জানিয়েছিলেন, হ্যাঁ অবশ্যই। আসলে বিবেকানন্দ ছিলেন কর্ম ত্যাগের নয়—কর্মযোগের সন্ন্যাসী।

বিশিষ্ট অতিথির ভাষণে প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা মা গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পূজিত ফুল দিয়ে মা গঙ্গাকে পূজা করার প্রয়োজন নেই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মহাবীর বাজাজ এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস।

স্বামীজীর জন্মজয়ন্তীতে শোভাযাত্রা ও আলোচনাচক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা।। স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৯ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ৩০ জানুয়ারি বিবেকভারতী পরিচালিত বেহালা রায়নগর মাঠ থেকে এক শোভাযাত্রা বেহালা অঞ্চল পরিক্রমা করে। ৬টি সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকাল ৯টায় এই পরিক্রমা উদ্বোধন করেন স্বামী বিরাগানন্দ মহারাজ। বিকেলে বিবেকানন্দের ভারতভাবনা বিষয়ক এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গোলপার্কের স্বামী চিদরূপানন্দ মহারাজ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক বিনায়ক সেনগুপ্ত, প্রাক্তন ফুটবলার তপন জ্যোতি মিত্র, তপন ঘোষ অলোক ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বিবেক ভারতীর সম্পাদক জয়ন্ত দাশগুপ্ত।

প্রকাশিত হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি, '১১
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি, '১১

সংস্কৃত ও সংস্কৃতি

প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বর্তমান ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই একটি সুসভ্য সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। সংস্কৃত না জানলে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারাগুলি জানা সম্ভব নয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ব্রাত্য। এই রাজ্যে মাদ্রাসার জন্য রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করা হলেও টোলগুলি অবহেলিত। যদিও সংস্কৃত না জানলে বাংলাভাষা চর্চা সম্ভব নয়, ভালো কম্পিউটার জানতে গেলেও এখন সংস্কৃতের প্রয়োজন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্বসংস্কৃত পুস্তকমেলা। পশ্চিমবঙ্গে 'সংস্কৃত ভারতী'র কাজ। এসব তথ্য নিয়েই বিশেষ বিষয়— সংস্কৃত ও সংস্কৃতি।

।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ পাঁচ টাকা।।
আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ব্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com